শেখ হাসিনা

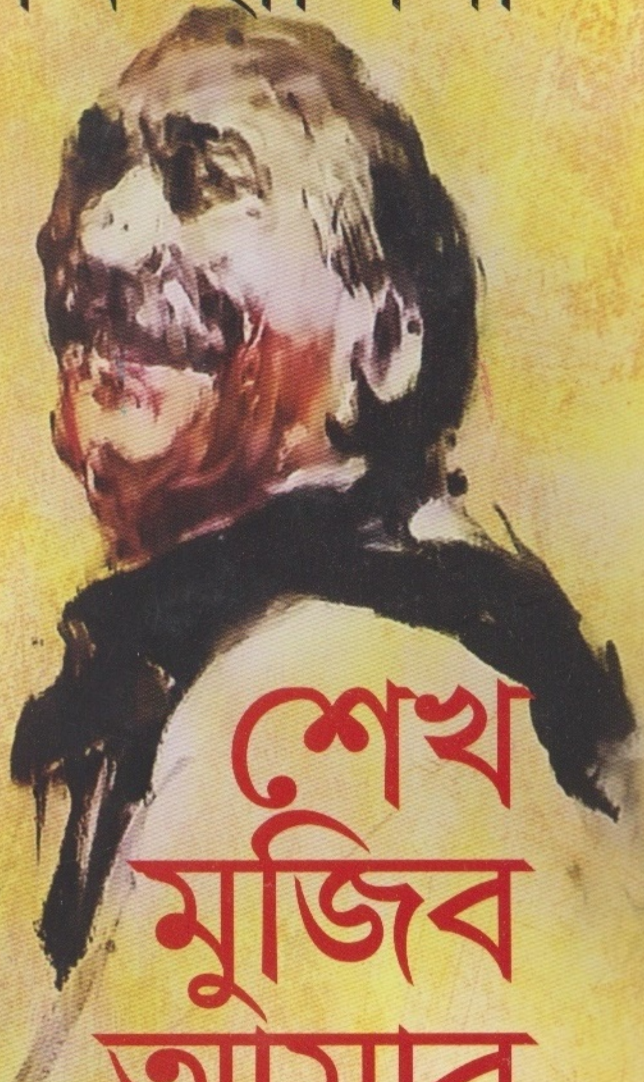

শেখ মুজিব আমার পিতা

শেখ মুজিব আমার পিতা গ্রন্থটি মূলত শেখ হাসিনা লিখিত স্মৃতিকথামূলক আত্মজৈবনিক রচনা। যাতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের অনেক অজানা তথ্য। এছাড়াও রয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস।

বাংলাদেশে এক সময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার যে অপচেষ্টা চলছিল, যেভাবে বিকৃত করা হয়েছিল জাতির গৌরবগাথা— এই গ্রন্থ থেকে পাঠক সেসবের একটি সঠিক চিত্র পাবেন।

ISBN 978 984 04 1994 4

www.pathagar.com

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৮১ সালে তাঁকে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভের মাধ্যমে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনে জয় লাভ করে তৃতীয় বারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৭); ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান (১৯৯৭); আব্যারডিন ড্যান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য (১৯৯৭); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৯); ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম (২০০০); ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কানেকটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র (২০০০); প্যাট্রিস লুবাম্বা পিপলস্ ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো, (২০০৫); সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, রুশ ফেডারেশন (২০১০) থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ধরিত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ), ২০০৫ সালে ফিলিপাইনের পার্লামেন্ট 'কংগ্রেশনাল মেডেল অভ অ্যাচিভমেন্ট', পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা বন্ধ ও শান্তি আনার লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি' সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো হুফে-বোগনি পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক শান্তি পদক ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য 'ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণপদক ২০০৯' এবং ২০১০ সালে তিনি জাতিসংঘ কর্তৃক 'মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল্ড' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

প্রচ্ছদ : মাসুম রহমান

www.pathagar.com

শেখ মুজিব আমার পিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা

শেখ মুজিব আমার পিতা

আগামী প্রকাশনী

www.pathagar.com

সপ্তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪২৩ ॥ আগস্ট ২০১৭
বিশেষ সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪২৩ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
পঞ্চম মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৩ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
চতুর্থ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২২॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
বিশেষ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ ॥ জুন ২০১৬
তৃতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২ ॥ এপ্রিল ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২১ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২১ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
ষষ্ঠ মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২৩ ॥ মার্চ ২০১৭

প্রকাশক
ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন +৮৮০২ ৯৫৯১১৮৫, ৪৭১১০০২১

প্রচ্ছদের চিত্রকর্ম
শাহাবুদ্দিন আহমেদ

প্রচ্ছদ
মাসুম রহমান

মুদ্রণ
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য ॥ ২৫০.০০ টাকা

Sheikh Hasina
Sheikh Mujib Amar Pita
(A Collection of Essays)
Seventh Print : Shrabon 1423 BE, August 2017

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : +8802 9591185, 47110021
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com

Price : 250.00 Only

ISBN: 978 984 04 1994 4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশের জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও
বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে
আরও গভীরভাবে জানতে আগ্রহী
অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

— পার্থ ঘোষ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, ১৯৯৯। থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই মেলা উদ্বোধন করেন। এই মেলাতেই 'সাহিত্যম্' প্রকাশনালয় থেকে শেখ হাসিনা রচিত, প্রফেসর রফিকুল ইসলামের ভূমিকা-সমৃদ্ধ ও পার্থ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থটি। সেই গ্রন্থটি লেখকের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশে এবার প্রকাশিত হলো।

স্বাধীনতা মহাকাব্যের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অনেকেই গ্রন্থ-রচনা করেছেন। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে পাঠক বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের এমন অনেক অজানা তথ্য খুঁজে পাবেন— যা আগে কোথাও পাননি। গ্রন্থটি মূলত শেখ হাসিনা লিখিত স্মৃতিকথামূলক সংক্ষিপ্ত আত্মজৈবনিক রচনা। যাতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনেক অনুল্লিখিত দিক এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস।

আগামী প্রকাশনী থেকে ইতঃপূর্বেও শেখ হাসিনার বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বইটি ভিন্ন কারণে ব্যতিক্রম। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার যে অপচেষ্টা চলছে, যেভাবে বিকৃত করা হচ্ছে জাতির গৌরবগাথা— এই গ্রন্থ থেকে পাঠক সেসবের একটা নির্দেশনা পাবেন বলে আশা করি।

গ্রন্থটিতে উৎসর্গ থেকে শুরু করে প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলামের ভূমিকা এবং পার্থ ঘোষ-এর প্রস্তাবনা স্থান পেয়েছে। দুটো মূল্যবান লেখায় গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনার লেখাগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বই প্রকাশ করা হয় পাঠকের জন্য। এই বইটি পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

ওসমান গনি
২৬ ডিসেম্বর, ২০১৪
ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ড. রফিকুল ইসলাম ১১
প্রস্তাবনা ॥ পার্থ ঘোষ ১৫

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি

শেখ মুজিব আমার পিতা ২৫
বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী ৩২
ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ৪১

মুক্তিযুদ্ধ ও পারিবারিক কথা

স্মৃতির দখিন দুয়ার ॥ এক ॥ ৪৭
স্মৃতির দখিন দুয়ার ॥ দুই ॥ ৫৪
স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার ৬৩

স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্য

ড. আবদুল মতিন চৌধুরী : আমার স্মৃতিতে ভাস্বর যে নাম ৭৬
বেগম জাহানারা ইমাম ৮৩
নূর হোসেন ৯১

ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি

একানব্বইয়ের ডায়েরি ১০২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের বাইরে শেখ হাসিনার পরিচিতি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, আশির দশকে বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের, নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ও রাজপথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী আর বিশ শতকের শেষ দশকের অপরার্ধে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনার অন্য পরিচয় বাংলাদেশের বাইরে খুব একটা জানা নেই, বিশেষত তাঁর লেখিকা পরিচিতি। শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও যে তিনি লিখে গেছেন, তাঁর লেখা যে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তিনি যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা এ সংবাদ শুধু দেশের বাইরে কেন দেশের মধ্যেও খুব একটা জানা নেই। শেখ হাসিনার অন্তত পাঁচটি স্বরচিত গ্রন্থ ও দুটি যৌথ সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে, যে তালিকা কম আকর্ষণীয় নয়। 'ওরা টোকাই কেন?' (১৯৮৮), 'বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম' (১৯৯৩), 'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র' (১৯৯৪), 'দারিদ্র্য দূরীকরণ : কিছু চিন্তাভাবনা' (১৯৯৫), 'People and Democracy' (১৯৯৭), শেখ হাসিনার পাঁচটি গ্রন্থ নয় বছরের মধ্যে প্রকাশিত। বেবী মওদুদের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত 'আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম' (১৯৯৭) আর 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' (১৯৯৮), যথাক্রমে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সভাসমিতিতে ও জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের সংকলন। উল্লিখিত গ্রন্থাবলি এবং আলোচ্য 'আমার পিতা শেখ মুজিব' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলি মিলিয়ে পাঠ করলে ১৯৭৫-'৯৫ দুই দশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

শেখ হাসিনা সঙ্গত কারণেই রাজনীতিকরূপেই অধিকতর পরিচিত, কিন্তু লেখিকারূপেও শেখ হাসিনার অবদান যে উপেক্ষণীয় নয় তার কারণ শেখ হাসিনার লেখা কোনো শৌখিন ব্যাপার বা অবসর বিনোদনের জন্যে নয়। পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই দুই দশক তিনি যে দুঃসময় অতিক্রম করেছেন সে সময় লেখনী ধারণ সহজসাধ্য ছিল না। তবুও যে তিনি না লিখে পারেননি তার কারণ দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, যা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে এবং পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ততা

www.pathagar.com

থেকে। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলি, যা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে একজন গভীর সংবেদনশীল লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি ও সচেতন মন-মানসিকতার পরিচয় মেলে যা গতানুগতিক রাজনৈতিক সাহিত্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশে যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ঘটে যায়, দৈবক্রমে তা থেকে রেহাই পেলেও সে ট্র্যাজেডির বিষাদ মূলত শেখ হাসিনাকেই এককভাবে সবচেয়ে বেশি বহন করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট হাসিনা শুধু তাঁর পিতা, মাতা, তিন ভাই, দুই ভ্রাতৃবধূ এবং পরিবারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনকেই হারাননি; সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে আর ছোট বোন শেখ রেহানা ও স্বামী ড. ওয়াজেদকে নিয়ে নিজেকে হতে হয়েছিল নির্বাসিত। সর্বোপরি পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও অনুগত চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যাঁরা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁরাই পারতেন বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে ঘাতকচক্র ক্ষমতাসীন আর বঙ্গবন্ধুর কন্যাদ্বয় নির্বাসিত, নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

একাত্তরের পরাজয়কে পঁচাত্তরের বিজয়ে পরিণত করে প্রতিবিপ্লবী ঘাতকচক্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনাকে সম্পূর্ণ অপসৃত করার জন্যে সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'ইনডেমনিটি' জারি করেছিল ফলে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থা বন্ধ এবং ঘাতকচক্র অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার নাম উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এমন অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল যে, পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ও তেসরা নভেম্বর যাঁরা চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন তারাই বুঝি অপরাধী তাঁদের হত্যাকাণ্ডের জন্যে আর সে জন্যেই যেন তারা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ! অপরদিকে পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই দুই দশক পঁচাত্তরের হত্যাকারীরা একের পর এক ক্ষমতাসীন শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। ঐ অবিশ্বাস্য পরিবেশে একাশি সালে শেখ হাসিনার নির্বাসন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এক মুমূর্ষু জাতির দেহে রক্তসঞ্চালনের মাধ্যমে সজীব করে তোলার মতো ব্যাপার। ফলে রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, বিস্মৃত বঙ্গবন্ধু তথা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির পুনর্জাগরণ ঘটে। সামরিক স্বৈরাচারের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্যে আর পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে জাতি সোচ্চার হয়ে ওঠে, আবার জেগে ওঠে বাংলাদেশ।

পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই বাংলাদেশ ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক স্বৈরাচার কবলিত, ঐ অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনে শেখ হাসিনার নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের রূপরেখা ছিল মুক্তির পথ-নির্দেশক। ঐ রূপরেখা বাস্তবায়নের ফলেই পরিণতিতে বাংলাদেশে নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু এবং গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পেরেছিল। তৃতীয় বিশ্বে একমাত্র বাংলাদেশেই বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনপ্রক্রিয়া চালুর পেছনে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা যে ভূমিকা রেখেছে তার মূল্যায়ন আজ অবধি হয়নি। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কার্যকর না হলে পঁচাত্তরের বিশ বছরের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি কখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা ইনডেমনিটি বাতিল এবং পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থা সম্ভবপর হতো না। বাংলাদেশে দীর্ঘ সামরিক শাসনের মধ্যেও এই গণতান্ত্রিক অর্জন সম্ভবপর হয়েছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জন্যেই।

শেখ হাসিনা রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান কিন্তু আশির দশকের প্রথম দিকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন গৃহবধূ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম এ ক্লাসের ছাত্রী। পঁচাত্তরের আগস্ট থেকে একাশির এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রবাসজীবন তাঁকে ছাত্রী থেকে ভবিষ্যত রাজনীতিকে রূপান্তরে কি ভূমিকা রেখেছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু একাশি সালের সতেরোই মে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আকস্মিক এবং অভাবিক হলেও তাঁর নিহত জনকের শূন্যস্থান গ্রহণ ছিল যৌক্তিক পরিণতি। এই ঘটনা তদানীন্তন সামরিক স্বৈরাচারের নিশ্চয়ই অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের গতি বড়ই বিচিত্র, যে নৃশংস প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের অপরাধে নির্বংশ করতে চেয়েছিল, যে অন্ধ শক্তি একাত্তরে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দানের অপরাধে চার জাতীয় নেতাকে কারাগারের অন্ধকারে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছিল, তারা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল একদিন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হবেন, জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল এবং দেশের প্রচলিত আইনে সাধারণ আদালতে মানবতার বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের বিচার হবে? এই ঘটনা পঁচাত্তরের ঘাতকচক্রের জন্যে অবিশ্বাস্য হলেও ইতিহাসের বাস্তব সত্য।

www.pathagar.com

পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই বাংলাদেশের ঐ প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনার ভূমিকা ও অবস্থান রাজনীতির ছাত্র মাত্রের জন্যেই আকর্ষণীয় বিষয় নিঃসন্দেহে কিন্তু 'শেখ মুজিব আমার পিতা' সংকলনের প্রতিপাদ্য শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন নয় বরং সংকলনের প্রতিপাদ্য সংঘাতময় দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রয়াত জননেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিশেষ কিছু লিখে যাননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চৌদ্দ বছর কারাগারে অতিবাহিত করলেও তাঁকে ষাটের দশকের শেষ দিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরূপে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বন্দিশিবিরে এবং একাত্তরে পাকিস্তানের বন্দিশিবিরে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থান করতে হয়েছে। শেখ হাসিনা যে আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের জটিল ও কুটিল এবং সংঘাতময় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেও ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও লেখায় বিরতি দেননি তাতে বোঝা যায় তিনি একজন জাত লেখক এবং যেকোনো পরিবেশেই তাঁর না লিখে উপায় নেই। শেখ হাসিনা রচিত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নির্বাচিত দশটি প্রবন্ধের এই সংকলন 'শেখ মুজিব আমার পিতা।' বাংলাদেশের বাইরে বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের লেখিকা শেখ হাসিনার রচনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের অবহিত করবে আশা করা যায়।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকুল ইসলাম
১৫.০১.১৯৯৯

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

বিশ্বের বহু রাষ্ট্রপ্রধানেরই নেশা লেখালেখি। এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও ব্যতিক্রম নন। রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যাঁদের অস্থির, শাসনক্ষমতায় দখল করা পদটি যাঁদের অনিশ্চয়তায় ভরা, এমনটি স্বদেশের পাহাড় প্রমাণ সমস্যার বোঝা সবসময়ই যাঁদের কাঁধটা মাটিতে নুইয়ে দিতে চায়— এশিয়ার সেই সব 'সাহিত্য-পাগল' রাজনীতিবিদ-রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু মুহূর্তের অবসর পেলেই বসে যান কাগজ-কলম নিয়ে। কেউ লিখে ফেলেন প্রবন্ধ বা স্মৃতিকথা। কেউ আবার কবিতা বা উপন্যাস।

ভারতের কথাই ধরা যাক। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জেল থেকে মেয়ে ইন্দিরাকে যেসব চিঠি পাঠালেন, সেসব চিঠিই সাহিত্যগুণে পরে বিখ্যাত বইয়ের চেহারা নিল। জওহরলালের লেখা বইয়ের সংখ্যা নেহাত কম নয়— 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', 'গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি', 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'। কোনটা ছেড়ে কোনটার নাম করব। জওহরলালের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও কম যান না। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই আছে— 'মাই ট্রুথ'। ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের এই সাহিত্যিক গুণপনার ধারা যে আজও অব্যাহত, তার প্রমাণ তো দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় ভরা ব্যস্ততার দিনগুলোতেও যিনি মনের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে একান্ত অবসরে কবিতায় রূপান্তরিত করেন। যদিও কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি বহুদিন ধরেই সাহিত্যিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতি সম্প্রতিই তো তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রাষ্ট্রনায়ক জুলফিকার আলি ভুট্টোর গ্রন্থ 'মিথ অব ইনডিপেনডেন্স' এবং তদীয় কন্যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর 'ডটার অব দি ইস্ট' রাজনৈতিক সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখালেখি তাই এই প্রতিপ্রেক্ষিতে বিস্মিত করে না। এশিয়ার রাজনীতিবিদদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি হয় আবেগপ্রবণতা ও সংবেদনশীলতা— শস্য-শ্যামল-নদীমাতৃক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা শেখ হাসিনার মধ্যে এসব গুণ আছে অতিরিক্ত মাত্রায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাই তো তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী। দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক। তাই তো শেখ

www.pathagar.com

হাসিনা রাজনৈতিক জীবনের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেই বসে পড়েন কাগজ-কলম নিয়ে। লিখে ফেলেন আপন আবেগের গাঢ় কালিতে একের পর এক প্রবন্ধ।

*   *   *   *

শেখ হাসিনার প্রবন্ধের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই হঠাৎই। ১৯৯৪ সালে। তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে বসেননি। যদিও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ততদিনে তাদের মনের মণিকোঠায় বসিয়ে ফেলেছেন হাসিনাকে। বঙ্গবন্ধুর শূন্য আসনে বঙ্গকন্যাকে। কারও কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার বোন। আবার কারও কাছে শুধুই হাসিনা আপা।

শেখ হাসিনার লেখা যে প্রবন্ধটি প্রথম আমার চোখে পড়েছিল তার শিরোনাম ছিল— 'স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার'। ১৯৯৪ সালের ১৪ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের পারিবারিক বাড়িটি শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ওই বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। হাসিনার এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক দিনটি উপলক্ষে।

অপূর্ব নস্টালজিক ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল ওই প্রবন্ধ। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি বাংলাদেশ রাজনীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। আশ্চর্য লাগল, হাসিনা সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমানুযায়ী সন্নিবেশ ঘটাতে গিয়ে কিন্তু বিষয়টিকে নীরস করে তুললেন না। বরং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর অজানা দিকগুলো সযত্নে তুলে ধরলেন। সেখানে কখনও মিলল আনন্দ। কখনও বা দুঃখ। আবার কখনও আনন্দ-দুঃখ একাকার হয়ে গেল। আনন্দের মুহূর্তেও বিচ্ছেদের সুর শুনিয়ে হাসিনা স্বাতন্ত্র্য আনলেন প্রবন্ধে।

লেখনীর এই গুণপনা স্বাভাবিকভাবে হাসিনার লেখালেখির প্রতি মন কৌতূহলী করে তুলল। খোঁজ নিয়ে দেখলাম হাসিনাকে নিয়ে লেখা বইয়ের তখন বেশ আকাল। এখনও যে বাংলাদেশে হাসিনার পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশিত হয়েছে— তা আমার অন্তত মনে হয় না। হাসিনাকে নিয়ে লেখা নানান বই পড়ে আমার বরং মনে হয়েছে প্রত্যেকটি বই একেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। তার ফলে হাসিনার সামগ্রিক চরিত্র বা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনো বইতেই ধরা পড়েনি।

তুলনায় শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরনের আলোচনা গবেষণা হয়েছে বাংলাদেশে। অমনই কিছু বই পড়তে গিয়ে মুজিব-কন্যা হাসিনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেলাম। জানলাম— আজিমপুর স্কুল ও বদরুন্নেসা কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে হাসিনা ভর্তি হয়েছিলেন

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ক্লাসে। বিষয় ছিল বাংলা সাহিত্য। পরে ওখানেই স্নাতকোত্তর এম এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

এবার অঙ্ক মেলাতে অসুবিধে হয় না। একজন সাহিত্যের ছাত্রী পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও যে লেখালেখির মধ্য দিয়ে আপন অনুভূতি-উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে চাইবেন— এটাই তো স্বাভাবিক। সাহিত্যের ছাত্রী হাসিনার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরাচার ও নব্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় দশককালে শেখ হাসিনা নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন। প্রাণসংশয়ের মুখেও পড়েছেন। আর এসবেরই ফাঁকফোকরে লিখে গেছেন একের পর এক প্রবন্ধ।

*   *   *   *

প্রধানমন্ত্রী হাসিনার লেখা দশটি প্রবন্ধ এই বইতে চারটি পর্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পর্যায়গুলোর শিরোনাম রাখা হয়েছে— বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও পারিবারিক কথা, স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি। প্রথম তিনটি পর্যায়ে আছে তিনটি করে প্রবন্ধ। শেষেরটিতে একটি।

পাঠকের কখনও মনে হতে পারে প্রবন্ধগুলো অনেকসময় ঘুরে বেড়িয়েছে নির্দিষ্ট বিষয় গণ্ডির বাইরে। একথাও সত্যি, বিশেষ এক উদ্দেশ্যের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে প্রবন্ধগুলো। এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক দোষটাও আমার। কারণ শেখ হাসিনা তো কখনও পর্যায়ের কথা স্মরণে রেখে প্রবন্ধগুলো লেখেননি। বই প্রকাশের সময়, উপস্থাপনার প্রয়োজনে তাঁর লেখা প্রবন্ধলোকে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এই ত্রুটি।

অন্যপক্ষে মনে রাখা দরকার বইতে অন্তর্ভুক্ত শেখ হাসিনার প্রবন্ধগুলো সবই ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে লেখা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বছরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বছরগুলোতে বারে বারে পরিবর্তনের ঢেউ অশান্ত করে তুলেছে বাংলাদেশকে। অশান্ত হয়নি কি শেখ হাসিনার জীবন?

১৯৮১ সালের ১৭ মে। আকাশভাঙা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ছ'বছর পর স্বদেশে ফিরলেন হাসিনা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাখ লাখ বাঙালি জড়ো হল ঢাকা বিমানবন্দরে। স্বদেশবাসীর আবেগ সেদিন ছুঁয়ে গেল হাসিনাকেও। কান্নাভেজা কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন— 'আমি নেতা নই। সাধারণ মেয়ে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার একজন কর্মী। বাংলার দুঃখী মানুষের জন্যে প্রয়োজন হলে এই সংগ্রামে পিতার মতো আমিও জীবনদান করতে

www.pathagar.com

প্রস্তুত।' বিমানবন্দর থেকে বনানী গোরস্থানে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট নিহত পরিবার পরিজনের কবর জেয়ারত করে তিনি তাঁর সংগ্রাম শুরু করলেন।

বাঙালি মাথায় তুলে নিল হাসিনাকে। বঙ্গবন্ধুর শূন্যস্থানে বসাল বঙ্গকন্যাকে।

আর বঙ্গকন্যা হাসিনা?

নির্ভীক হাসিনা ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বৈরাচার ও সেনাশাসনের বিরুদ্ধে। টুঙ্গিপাড়ায় শেষ শয়ানে শায়িত বাবা শেখ মুজিবের অসম্পূর্ণ কাজ যে তাঁকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য— বাঙালিকে ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। যে অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সোচ্চারে ঘোষণা করলেন তিনি— 'জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাই আমার রাজনীতি।'

বইতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো যেহেতু সেই আন্দোলনমুখর দিনগুলোতে লেখা, তাই এই সব প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে যে শেখ হাসিনা তৎকালীন শাসক দলের অনৈতিক কাজকর্মের সমালোচনা করবেন বা জনগণের দাবি আদায়ের সমর্থনে প্রচার চালাবেন— সেটাই তো স্বাভাবিক! হাসিনার এই প্রবন্ধগুলোকে তাই তাঁর সেই সময়কার আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বললে অযৌক্তিক হয় না।

*   *   *   *

'শেখ মুজিব আমার পিতা', 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী' এবং 'ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড'— তিনটি প্রবন্ধই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা।

আগেই উল্লেখ করেছি, শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী বা তাঁর মূল্যায়ন করে লেখা বহু বই ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হাসিনার লেখা এই তিনটি প্রবন্ধ পাঠের পর মনে হয়েছে, শেখ মুজিবের জীবনের অনেক ঘটনাই আজও অজানা রয়ে গেছে। যে অজানা অজ্ঞাত দিকটা একমাত্র হাসিনাই পারেন আলোকিত করতে। কারণ তিনি তো শুধু মেয়ে হিসেবেই নন, রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী হিসেবেও ছিলেন বাবা মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সেই ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বাবার সম্পর্কে শোনা-দেখা নানা ঘটনার মালা গেঁথেছেন হাসিনা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' প্রবন্ধে। যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণ তাঁর বঙ্গবাসীর জন্য কাঁদত, সেই প্রাণ যে শৈশবেও একইভাবে কাতর হত— তার একটা অনুপম বিবরণ দিয়েছেন হাসিনা এই প্রবন্ধে। যেখানে হাসিনার দাদি একদিন দেখেন— 'তাঁর খোকা চাদর জড়িয়ে

www.pathagar.com

হেঁটে আসছে। পরনের পায়জামা পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শতচ্ছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছে।' হাসিনার দেওয়া আর একটা বিবরণ অন্য দিক থেকে মর্মান্তিক। দীর্ঘদিন জেলবন্দি বা ভুলে যাওয়া বাবা শেখ মুজিবুরকে দেখে পুত্র কামাল তার আপা হাসিনার কাছে অনুমতি চেয়েছে— 'হাসুপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' ছোট্ট অথচ মর্মান্তিক এই ঘটনা প্রমাণ দেয়— কত ত্যাগ-তিতিক্ষার পথ ধরে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারকে হাঁটতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর যে দুটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক চরমে ওঠে, তা নিয়েই হাসিনার লেখা এই পর্যায়ের পরের দুটি প্রবন্ধ। 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী' প্রবন্ধে হাসিনা লিখেছেন— 'বাস্তব কি নির্মম! জাতির জনকের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত তাঁরই প্রিয় সেনাবাহিনী।' তবে তিনি যে তা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন না। একের দোষ দশের ঘাড়ে চাপাতে চান না— সে ব্যাপারেও অকপটে জানিয়েছেন এই প্রবন্ধে— 'আমি বিশ্বাস করি সমগ্র সেনাবাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়।... সেনাবাহিনী জাতির প্রতিবন্ধক নয়; ক্ষমতালোভীদের উচ্চাভিলাষই হচ্ছে সকল প্রতিবন্ধকতার উৎস।'

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদঘাটন ও তার বিচারের দাবিতে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি একটানা আন্দোলন চালিয়ে গেছেন মুজিব-কন্যা হাসিনা। তাঁর সেই অনমনীয় আন্দোলনের একটি দলিল বলা যেতে পারে এই পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধ 'ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড।' এই প্রবন্ধে হাসিনা ১৯৭৫ সালের সেই নির্মম ঘটনার বিবরণ দিয়ে ব্যাখ্যায় নেমেছেন— কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে? মুজিববিহীন বাংলাদেশের আজ কী অবস্থা? শেষে তিনি অঙ্গীকার করাতে চেয়েছেন— 'জাতীয় শোক-দিবসে প্রতিটি বাঙালিকে শপথ নিতে হবে যে, বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাব। জনতার আদালতে খুনিদের বিচার করব। ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটন করে বাংলার মানুষদের বাঁচাবো।'

আজ এই বই যখন প্রকাশিত হতে চলেছে, তার কয়েকদিন আগেই সময় প্রমাণ করে দিয়েছে হাসিনার সেদিনের অঙ্গীকার ব্যর্থ হয়নি। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটে গেছে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রায় ঘোষণা হয়েছে মুজিবহত্যা মামলার। দোষীদের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

* * * *

'স্মৃতির দখিন দুয়ার', 'স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার'— প্রবন্ধেই ধরা পড়েছে হাসিনার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও পারিবারিক কথা।

www.pathagar.com

প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো কাটাতে হয়েছিল মুজিব-পরিবারকে। হাসিনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' প্রবন্ধে এমন অভিজ্ঞতারই এক দীর্ঘ বর্ণনা আছে। মুক্তিযুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে। রেসকোর্স ময়দানে যখন পাক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে হাসিনারা বন্দি ছিলেন ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের বাড়িতে। কানে ভেসে আসছে বিজয়োল্লাস, অথচ তাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে মৃত্যুর মুখোমুখি। রুদ্ধশ্বাস একটি দিন ও রাত। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় হাসিনার গতিশীল বর্ণনা। পরে যখন তারা মুক্তি পেলেন, তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাঠকও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই প্রবন্ধে উপরি পাওনা নির্ভীক অকুতোভয় বেগম মুজিবকে আবিষ্কার। পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করা মাত্র তিনি বেরিয়ে এসেছেন ঘর ছেড়ে। হাসিনা লিখছেন— 'মা সঙ্গে সঙ্গে আবদুলকে হুকুম দিলেন, পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলতে। পতাকাটি নামিয়ে যার হাতে দিতেই মা ওটাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে শুরু করলেন। তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুন ধরিয়ে দিলেন।'

শুধু নির্ভীকতাই নয়, বেগম মুজিবের চরিত্রে আরও নানা গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। 'স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনা' প্রবন্ধে এমন কিছু গুণের প্রকাশ আছে বিভিন্ন ঘটনায়। হাসিনা লিখেছেন— 'আন্দোলনের সময় বা আব্বা বন্দি থাকা অবস্থায় পার্টির কাজকর্মে বা আন্দোলনে খরচের টাকাও মা যোগাতেন। অনেক সময় বাজার হাট বন্ধ করে অথবা নিজের গায়ের গহনা বিক্রি করেও মাকে দেখেছি সংগঠনের জন্য অর্থের যোগান দিতে।' এরই পাশাপাশি যখন কোনো মাঝরাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা হাতে পুলিশবাহিনী বাড়ি চড়াও হতো তখন বেগম মুজিবকে দেখা যেত অন্য ভূমিকায়। হাসিনার ভাষায়— 'মাও চোখের পানি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন আর আব্বার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছেন, অনেকগুলি এরিনমোর তামাকের কৌটো দিলেন— পরে পাঠাতে অসুবিধা হয় বলে লেখার জন্য কাগজ, কলম, খাতা সাথে দেন। কিছু বইপত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী মা গুছিয়ে দিলেন।'— এমন আচরণ তো বঙ্গবন্ধুর মতো দেশনেতার স্ত্রীর পক্ষেই শোভা পায়।

'স্মৃতির দখিন দুয়ার ॥ দুই ॥' প্রবন্ধে হাসিনা আবার তুলনায় বেশ কাব্যিক। ছোট ছোট বাক্যে সাজিয়ে তুলেছেন শৈশবের গ্রাম-জীবনের ছবি। চিত্রকল্প রচনায় তিনি যে প্রথম সারির যেকোনো সাহিত্যিককে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এই প্রবন্ধের বেশ কয়েকটি অংশে। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত তুলে ধরি— 'বাইগার নদী এখন টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পাশ

www.pathagar.com

দিয়ে কুল কুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে সে নদীর পানি রুপোর মতো ঝিকমিক করে। নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারি সারি খেজুর, তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ-কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতা-পাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক।' এই প্রবন্ধেই হাসিনা ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন— 'আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গিপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটা ঘর তৈরি করার।' শহুরে কল-কোলাহলের মধ্যে বসবাস করলেও হাসিনার হৃদয়কে যে গ্রাম-জীবন এখনও কতখানি প্রভাবিত করে রেখেছে এই প্রবন্ধ তার প্রমাণ।

*   *   *   *

স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্য শিরোনামে সংকলিত করা হয়েছে হাসিনার লেখা তিনটি প্রবন্ধ। তিনটি প্রবন্ধে তিনটি ব্যক্তিত্বের কথা লিখতে গিয়ে হাসিনা কিন্তু সাল-তারিখের ছকবাঁধা পথ ধরে হাঁটেননি। বরং প্রত্যেকের সঙ্গে তার পরিচয়ের সূত্রপাত থেকে শুরু করে আপন অভিজ্ঞতার আলোয় ধরা পড়া তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রবন্ধগুলোতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ। হাসিনার কথায়— 'এই মহান মানুষটিকে ঘিরে আমার জীবনের সবচাইতে করুণ, বেদনাঘন, হাহাকারে পরিপূর্ণ একটি বিশেষ স্মৃতি রয়েছে।' ১৯৭৫ সালে হাসিনা যখন তাঁর স্বামী বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদের কর্মস্থল ইটালি যেতে চাইলেন, তখন মতিন চৌধুরীই হাসিনাকে বারবার নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস, বোন রেহানাকে নিয়ে সেই সময় বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন বলেই ১৯৭৫ সালের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পান তাঁরা। পরে যখন হাসিনা স্বদেশে ফেরেন, স্বাভাবিকভাবে মতিন চৌধুরীর কাছ থেকে পিতৃস্নেহের অভাব ঘটেনি। আন্দোলনের দিনে পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ সাহায্য। তাই তো হাসিনার মনে হয়েছে— 'তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন নির্ভীক সমাজসচেতন মানুষ।'

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে শহীদ জননী বেগম জাহানারা ইমামের সঙ্গে নিজেকে এক অদ্ভুত সাযুজ্যের বন্ধনে খুঁজে পেয়েছেন হাসিনা— 'যিনি এক সন্তানহারা মা আর আমি এক মা-বাবা-ভাই হারা।... স্বজন হারাবার ব্যথায়

www.pathagar.com

ব্যথিত আমি বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি সন্তানহারা বেদনায় জর্জরিত।' জাহানারা ইমামের প্রতি যে হাসিনার কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তার প্রকাশ ঘটেছে ছোট্ট একটি মন্তব্যে— 'একদিন আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে যাই একজন মুক্তিযোদ্ধার মাকে দেখাবার জন্য।' এই মুক্তিযোদ্ধার মা ছিলেন জাহানারা ইমাম। তাঁর মৃত্যুর পরেও তৎকালীন বিএনপি সরকার তাঁকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেখায়নি। মিথ্যা মামলা মাথায় নিয়ে তাঁকে কবরে যেতে হয়েছিল। এই উপেক্ষা-অবহেলা ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল হাসিনার হৃদয়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে সেদিন তিনি বলে উঠেছিলেন— 'তাতে জাহানারা ইমামের কোনো সম্মানহানি হয়নি। তাঁকে বাঙালি জাতি সম্মান দিয়েছে শহীদ জননী হিসেবে। মুক্তিকামী মানুষ তাঁকে সম্মান দিয়েছে হৃদয়ের গভীর উষ্ণতায়।'

তুলনায় তৃতীয় প্রবন্ধে নূর হোসেন চরিত্রটি যথার্থই যেন মিছিলের একটি মুখ। আন্দোলনের প্রতীক। এরশাদের পদত্যাগের দাবি-মিছিলে নূর হোসেনকে প্রথম দেখেন হাসিনা। বুকে পিঠে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক' নূর হোসেন যখন বলে ওঠেন— 'জান দিয়া দিমু আপা, আপনে শুধু মাথায় হাত বুলাইয়া দ্যান।' হাসিনার মধ্যে তখন প্রকাশ পায় মমতাময়ী রূপ। উত্তর দেন— 'না, জীবন দেবে ক্যানো, আমি আর শহীদ চাই না, আমি গাজী চাই।' নূর হোসেন কিন্তু শহীদ হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিল সেদিন। তাই তো প্রবন্ধের শেষে হাসিনা স্বীকার করেছেন— 'তুমি প্রতিবাদের প্রতীক।... তুমি আজ পোস্টার হয়ে রয়েছো প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙালির হৃদয়ে।'

*　　*　　*　　*

একানব্বইয়ের ডায়েরি অন্যদিকে কতকগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া ছবির কোলাজ। শেখ হাসিনার লেখনীর অন্য ধরনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই একটি লেখার সন্নিবেশ ঘটানোর প্রয়োজন হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, স্বদেশবাসীর জন্য হাসিনার প্রাণ কাঁদে। ১৯৯১ সালে সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক তাণ্ডবে যখন বহু মানুষ মারা গেছে, বহু সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে— বিরোধী দলের নেত্রী হাসিনা তখন ছুটে গেছেন অকুস্থলে। পাশে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ মানুষের। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় লেখা সেই দিনলিপির মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক তাণ্ডবের বীভৎসতা, বিভীষিকার মাঝে দাঁড়িয়েও সাহিত্যিক হাসিনার শিল্পীমন সজাগ হয়ে উঠেছে। অস্তমিত সূর্যের আলোয় চট্টগ্রামের সমুদ্রের জলে মুহূর্তের মধ্যে যে রঙের খেলা শুরু হয়ে যায়,

www.pathagar.com

সেই সৌন্দর্য চোখ এড়িয়ে যায়নি হাসিনার। অপরূপ বিবরণ দিয়েছেন তিনি সেই রসাস্বাদনের। এরই পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথাও ভুলে যাননি শেখ হাসিনা। দুর্যোগ মোকাবিলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন— 'পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, যত মানুষ মরবার কথা ছিল তত মানুষ মরে নাই। জানি না আরও কত মানুষ মরলে তার— যত মানুষ মরার কথা— তত মানুষ হবে, সেটাই প্রশ্ন। আর কত লাশ তিনি চান?'

*　　　*　　　*　　　*

প্রস্তাবনা দীর্ঘ মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, এরও প্রয়োজন আছে। শেখ হাসিনার এই প্রবন্ধগুলো পড়ার সময় তাঁর জীবনও বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ভুলে গেলে চলবে না। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি, বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের লেখালেখি সম্পর্কে যতখানি ওয়াকিবহাল, পশ্চিমবঙ্গের পাঠক বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে ততখানিই নিস্পৃহ। শেখ হাসিনার প্রবন্ধ সংকলনের প্রস্তাবনা হিসেবে তাই এই দীর্ঘ উপস্থাপনার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করতে চাই। এই প্রস্তাবনার উপসংহার লেখার সময়ই শান্তিনিকেতন থেকে খবর এসেছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবার 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করা হবে। যে সব বিষয়ে স্বীকৃতি জানিয়ে বিশ্বভারতী থেকে তাকে সম্মান সূচক ডি.লিট দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে একজন লেখিকা হিসেবে গুণাবলি অর্ন্তভুক্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য শান্তিনিকেতনে যখন বঙ্গকন্যা হাসিনাকে দেশিকোত্তমে সম্মানিত করা হবে— তখনই প্রকাশিত হয়ে পড়বে তার লেখা প্রবন্ধের এই সংকলন। নিঃসন্দেহে সময়ের এই সন্ধিক্ষণ ঐতিহাসিক। গৌরবান্বিত হবে এই প্রকাশনা।

কলকাতা　　　　**পার্থ ঘোষ**

১ জানুয়ারি, ১৯৯৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শেখ মুজিব আমার পিতা

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকে-বেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখা নদীর একটি নদী বাইগার নদী। নদীর দুপাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এসে এই নদী-বিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমা-মণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন। এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদী জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থা প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমি-জমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান কোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে আর আশে পাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর পূর্ব কোণে টিনের

www.pathagar.com

চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান। আমার আব্বা, আর তাই আমার দাদির বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।'

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথা মতো যা বলতেন তারা তাই করত। আবার এগুলি দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের উপর। এই পোষা পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এ জন্য ছোট বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড় কাচারি ঘর। আর এই কাচারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলবি সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন।

আমাদের পূর্ব পুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলে প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুলে থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। আর একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর

www.pathagar.com

এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর বেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন কিভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সবসময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্ট বেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসেরও সীমা ছিল না কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুশ-নুদুশ হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুপু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড় ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড় দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার ও দাদির বোনদের ছেলে-মেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো আঠারো জন ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।

আব্বার বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তার দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন চার বছরের বড়। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্জিয়ান) মুরুব্বি করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মানুষ হন।

www.pathagar.com

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, 'তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়তো। আব্বা যদি ধারে কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হল মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশুনা করতো। চার পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হত। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায় আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো কারণ আর কিছুই নয়। কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে, তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড়ে দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনোদিনই বকাঝকা করতেন না বরং

www.pathagar.com

উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজে কখনও তাঁরা বাধা দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ, যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আব্বার একজন স্কুলমাস্টার একটা সংগঠন গড়ে তুলে এবং বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল, যোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করাবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৬ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজ ফুপু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুপুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুদিন বা তিন দিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুপুর খোঁজ খবর নিতে যেতেন তখন ফুপু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্না এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট আর আমার ছোট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনও দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড় পুকুর আছে, যার পাশে বড় খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাই-বোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না! আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই।

www.pathagar.com

ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি; আমার মা, কামাল, জামাল, ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহেদির রং বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুপাতো ভাই শেখ মনি, আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী শেখ মনির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে আক্রমণ করেছে আবদুল রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুপা), তাঁর তেরো বছরের কন্যা বেবী, দশ বছরের ছেলে আরিফকে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর চার বছরের শিশু পুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন— তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজ ফুপু।

যেদিন কামাল আব্বাকে 'আব্বা' ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই— আজ যে বার বার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

১৩ আগস্ট, ১৯৯১

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের প্রতিটি মানুষের অতি আপনজন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্যই ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ। স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য তাঁর স্নেহ ও দায়িত্ব কিছু কম ছিল না। যারা সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই অশুভ শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেনাবাহিনী নিয়ে একটা বিতর্কের সূত্রপাত করা। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্য বা জনগণ কেউই তা চায় না। এতে শুধু সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে না, জনসাধারণের সাথে বিচ্ছিন্নতাও বেড়ে যাবে। সেনাবাহিনী নিয়ে যেকোনো ধরনের বিতর্কই দেশের জন্যও হবে আত্মঘাতী। জনগণের সাথে একাত্মতাবোধ নষ্ট হলে তাদের উপর অর্পিত দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন বিঘ্নিত হবে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণের সহজ শিকারে পরিণত হয়। কোনো দেশপ্রেমিক সুস্থ মানুষই এ রকম অবস্থা কামনা করতে পারে না।

পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনী জনসাধারণের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিল। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সকল প্রস্তুতি ও জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে নস্যাৎ করে আটান্ন সালে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসেছিল। গভীর রাতে ক্ষমতার হাতবদল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চরিত্রকে করে তুলেছিল কলঙ্কিত। বেলুচিস্তানে বোমা ফেলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার হরণ করে সেনাবাহিনী চূড়ান্তভাবে

www.pathagar.com

জনগণের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিল। সংঘাত ছিল যার স্বাভাবিক পরিণতি। আজও পর্যন্ত পাকিস্তানে সেই সংঘাতের অবসান ঘটেনি।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই বাংলাদেশ পাকিস্তানি শাসক-শোষকচক্রের বাজারে পরিণত হয়ে একটি নয়া উপনিবেশ হিসেবে গড়ে উঠল। তবে, এ অবস্থা প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। আর এর থেকে শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী গণ-সংগ্রামের। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯ এর ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশের অভিযাত্রায় এক-একটি পতাকাচিহ্ন। এসব আন্দোলন আর সংগ্রামের স্তরে স্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ঘটে উত্তরণ। ১৯৭১-এ এসে তা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর বাঙালি জনতা একীভূত হয়ে যায়।

আমাদের ইতিহাসের এ পর্যায়ক্রমিক ধাপে অন্যান্য দাবির পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও বেসামরিক চাকরিতে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তি, পদোন্নতি ইত্যাদি প্রশ্নে যে বৈষম্যমূলক নীতি বিরাজ করছিল, তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু প্রথম থেকেই ছিলেন সোচ্চার। আর এ কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিতে পূর্ববাংলার জন্য স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী এবং নৌ সদর পূর্ব বাংলায় স্থাপনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। বাঙালির সেদিনের সংগ্রাম ও আন্দোলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সমগ্র জাতির মতোই তার সে আবেদন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিল অভূতপূর্ব। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ১৯৭১ এর রক্তে বান ডাকানো দিনগুলিতে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের উপর। সে মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নং ধানমন্ডি সড়কের বাড়ি থেকে ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। তিনি ডাক দিলেন সকল বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে। শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধ। চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও যুদ্ধের আহ্বান ওয়ারলেস যোগে পৌছে দেয়া হল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনতা ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ান ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ান ভাইয়েরা। আর এভাবেই সূচনা হল একটি নতুন দেশ ও একটি নতুন সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টির। বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও নিজেদের দেশপ্রেমের জন্যই একটি শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে গড়ে উঠতে পেরেছে আমাদের সেনাবাহিনী। বিজয়ী সৈনিকের উপযোগী স্বাধীন দেশের বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তাই বঙ্গবন্ধু ও এদেশের জনগণ স্বাধীনতার পর সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীকে আর সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত করার জন্য জনসাধারণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সংকুচিত করতে হয়েছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অনেক জরুরি কর্মসূচি। তবুও সেনাবাহিনীর চাহিদা মেটাতে কুণ্ঠিত হয়নি বাংলার মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিলেন যেমনি স্নেহপ্রবণ তেমনি দায়িত্বসচেতন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তখন হাজার সমস্যা। হানাদার বাহিনী পিছু হটার সময় রাস্তাঘাট, রেলসেতু, ব্রিজ, কালভার্ট সব ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। অকেজো করে দিয়েছে বন্দর। জ্বালিয়ে ফেলেছে অনেক শহর, গ্রাম। দেশের কলকারখানা প্রায় সব ক'টাই ছিল বিধ্বস্ত। কৃষিকাজও তখন প্রায় বন্ধ। তার উপর এক কোটি শরণার্থীর সমস্যা। যুদ্ধে নিহত, আহত, ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবার। ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে মুক্তি পাওয়া সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সম্পদ বলতে তখন শুধু মানুষের ঐক্য ও কর্মস্পৃহা। এরকম অবস্থায় বঙ্গবন্ধু হাত দেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে। কিন্তু তাতেও সেনাবাহিনীর চাহিদা একটুকু খাটো করে দেখেননি তিনি। সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার। ইনফ্যানট্রি, আর্টিলারি, সিগন্যাল, আর্মড, ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ান এবং আনুষঙ্গিক ইউনিটসহ তিনি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী জন্মলগ্নেই সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ আন্তরিকতা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনী।

www.pathagar.com

দেশ তখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। বঙ্গবন্ধু হাঁপিয়ে উঠেছেন দশ কোটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে। বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও তখন তুঙ্গে। সেই সংকটের সময়ও বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনীর কথা। খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভার। যুগোশ্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পদাতিক বাহিনীর জন্য আনা হয় ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র। ভারতের অনুদান ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। সে সময়ে মিগ-২১ ই ছিল এই উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক বিমান। আজ পর্যন্ত তার সমকক্ষ কোনো জঙ্গি বিমান আওয়ামী লীগ-পরবর্তী সরকারসমূহের পক্ষে সামরিক বাহিনীর জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেই মিসর থেকে আনা সম্ভব হয়েছে সাজোঁয়া গাড়ি বা ট্যাংক। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেনাবাহিনীর অফিসাররা। জেনালের এরশাদ নিজেও সে সময় দিল্লিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করেন এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলেন। এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর প্রতি কোনো প্রকার অনীহা প্রকাশ করেননি। তিনি সামরিক একাডেমি স্থাপন করে আরও নতুন নতুন তেজোদীপ্ত তরুণের সমন্বয়ে সেনাবাহিনীকে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন।

পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী আরও ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। এ কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তৎকালীন সেনাবাহিনীর অনেক কর্তাব্যক্তি এই পুনর্বাসনের বিরোধিতা করেছেন। অনেক জেনারেল বিভিন্ন সেনাছাউনিতে গিয়ে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বক্তৃতাও করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত উদার ও যুক্তিপূর্ণ

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকারী হাজার হাজার সৈনিক ছিল দেশেরই সন্তান। তারা দেশের শত্রু ছিল না। জাতির জনক হিসেবে তাদের প্রতি অনুদার ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তাছাড়া সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজনও ছিল। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করাই বঙ্গবন্ধু যুক্তিসংগত মনে করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তখন ত্রিশ-চল্লিশ জন মাত্র কর্মকর্তা। আর প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় তেরো শত। বঙ্গবন্ধু সেদিন অত্যন্ত সততার সঙ্গে সকল অফিসার ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

বঙ্গবন্ধু সকলকে শুধু চাকরিতে পুনর্বাসনই করেননি, কমকর্তা ও সদস্যদের জন্য নির্ধারণ করেছেন পদোন্নতির প্রণালি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেছেন। আজকের কর্মকর্তা ও সেনানায়কদের পদমর্যাদা লক্ষ করলেই এর সত্যতা মিলবে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তা ও জওয়ানদের পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালীন বেতন প্রদান করেন। সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহের জন্যই শুধু বঙ্গবন্ধু ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, সেনাছাউনির (ক্যান্টনমেন্ট) উন্নতি ও নতুন ছাউনি নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয় তখনই। পুরোনো ছাউনিগুলোতে নতুন নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার সাথে নতুন ছাউনিও গড়ে ওঠে সারাদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'দিঘনালা', 'রুমা', 'আলিকদম'-এর মতো সামরিক গুরুত্বপুর্ণ ৩টি ছাউনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই গড়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারই প্রথম সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের রেশন নিকটস্থ্ সেনাছাউনি থেকে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে যারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে ছাউনিতে অবস্থান করতেন তারাই শুধু এ সুযোগ লাভ করতেন।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফল। অথচ এ নিয়েও এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রচারের ঘোলাজলে মাছ শিকারে নেমেছিল। জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনোদিনই সামরিকবাহিনীর বিকল্প ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেরও প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। দেশের আইন-শৃংখলা

www.pathagar.com

পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবির মধ্যেই বাঙালির সামরিক স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে জনগণের কল্যাণের জন্যই বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের সহায়ক শক্তিরূপে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেন—যার সদস্যসংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর মাত্র ৬ ভাগের এক ভাগ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেরত দেয়া অস্ত্রেই শুধু তারা সজ্জিত ছিল। কোনো ব্যাটেলিয়ানেই ৬ থেকে ৭ টার বেশি হালকা মেশিনগান ছাড়া ভারি অস্ত্র ছিল না। প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে, আইন-শৃংখলা রক্ষায় ও সর্বোপরি সদ্য স্বাধীন দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ধরনের বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা সারা বিশ্বে বিদ্যমান। সেভাবেই বঙ্গবন্ধুও গঠন করেছিলেন জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনী গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ের মধ্যে, যখন দেশ স্বাধীনতার ধকল সামলে উঠতেই হিমসিম খাচ্ছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজই ছিল তখন জরুরি। তার মধ্যেও সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাহত হতে দেননি বঙ্গবন্ধু, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছেন।

এদেশের সেনাবাহিনী তাই গড়ে উঠেছে জনসাধারণের স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে, বঙ্গবন্ধুর গর্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে। সেই সেনাবাহিনী নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠবে এ কথা কল্পনা করাও ছিল কঠিন। তাই সত্য হয়েছে বাংলাদেশে।

জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী উচ্চভিলাষী অফিসারের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং এই কুচক্রীরা জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচিকে বানচাল করে বাংলাদেশে প্রগতির ধারা পাল্টে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে। একের পর এক নিজেদের ক্ষমতারোহণ, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুর্নীতি প্রভৃতি সেনাবাহিনীকে অভ্যুত্থানকারীরা তাদের স্থায়ী বাহনে পরিণত করে চলেছে। এমনকি ক্ষমতালোভীরা সেনাবাহিনীর নামে হুমকি দিচ্ছে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করে তাদের বার বার যুক্ত করা হচ্ছে সুবিধাবাদী সমাজবিরোধী ও অসৎ চরিত্রের ক্ষমতাশ্রয়ী সংগঠনের সাথে।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনরা উসকে দিচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠনে কলহ-বিভেদ। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ঠেলে দিয়ে নেতা-কর্মীদের চরিত্র হননের অশুভ প্রক্রিয়ার সূচনাও করেছে দেশে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতার লোভে অভ্যুত্থানকারী ও তাদের দোসররা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে জনগণের প্রতিপক্ষরূপে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এদেশে সূচনা করা হয়েছে হত্যার রাজনীতি। অন্যায়ভাবে অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাজনীতিতে আগত দুশ্চরিত্র কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগির এক অশুভ প্রক্রিয়া চলছে। পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের ধারাও এক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে। ক্ষমতার লড়াইয়ে এক-একটি সামরিক অভ্যুত্থানে যেমনি প্রাণ দিতে হয়েছে বীর সৈনিকদের তেমনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে গত এক দশকে শহীদ হয়েছে বহু ছাত্র-জননেতৃবৃন্দ।

গত দশ বছরে দেশের অবস্থাও হয়েছে আরও সংকটাপন্ন। সামরিক শাসন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে যেমনি অস্থির করে তুলেছে। তেমনি নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু-কিশোর হত্যা, খুন, ডাকাতি, ব্যাংকের টাকা লুট, ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি, সরকারি অর্থ অপব্যয় বেড়ে চলছে। বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ, ভূমি-সংস্কার, বৈদেশিক নীতি, সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচি বিসর্জন দিয়ে আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য। ক্ষমতাসীনরা সামরিক বাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে নির্যাতনের মুখে।

অথচ বঙ্গবন্ধুর কত গর্বই না ছিল এই সেনাবাহিনী নিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ছিল তাঁর স্বপ্নের বাস্তবরূপ। কুমিল্লার সামরিক একাডেমিতে প্রথম সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি পূর্ণ সুযোগ পেলে আমাদের ছেলেরা যেকোনো দেশের যেকোনো সৈনিকদের সাথে মোকাবিলা করতে পারবে, তাদের সে শক্তি আছে।' তিনি সেদিন তাদের প্রতি শৃংখলা ও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব কি নির্মম! জাতির জনকের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত তাঁরই প্রিয় সেনাবাহিনী! কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সমগ্র সেনাবাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়। অথচ ১৫ আগস্টের হত্যার দায়িত্বের বোঝা তাদের বয়ে

www.pathagar.com

বেড়াতে হচ্ছে। ক্ষমতাসীনচক্র খুনিদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার আজও হয়নি বলেই হত্যার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর কাঁধে চেপে আছে। সেনাবাহিনীর শৃংখলার কারণেও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বাঞ্ছনীয় ছিল। আসলে ক্ষমতাসীনরা সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কারণেই খুনিদের বিচার করতে চায় না। সেনাবাহিনীর উপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে রাখতে চায়। এইসব ক্ষমতালোভী সেনানায়করা কথার চমক দিয়ে সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্বের প্রশ্ন তুলেছে এই বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য। সংবিধানে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। দেশরক্ষা, দেশের উন্নয়ন, দুর্যোগকালে সহায়তা— এই সকল ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনীর দায়িত্ব রয়েছে। সঙ্গীন নয়, সহৃদয়তাই স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্কের মাপকাঠি। অথচ উচ্চাভিলাষীরা সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক সেতু ভেঙে জনগণ ও সৈনিকদের মধ্যে প্রতিপক্ষ চেতনার স্থায়ী সংঘর্ষ বাধিয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে চায়। ১৫ আগস্টের পর যেমনি জনগণ হারিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার, দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে সংকট— ঠিক তেমনি সেনাবাহিনীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাদের করে তোলা হয়েছে বিতর্কিত। এই অবস্থা দেশের জন্য কিছুতেই কল্যাণকর হবে না। ধুরন্ধর ক্ষমতালোভীরা সৈনিক ও জনতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে সেনাবাহিনী ও জনগণের উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে গত দশ বছর ধরে।

সেনাবাহিনী জনগণের পবিত্র আমানত। তারা দেশরক্ষা করবে, দেশ শাসন করা তাদের দায়িত্ব নয়। আমি স্পষ্টই মনে করি রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সৈনিকদের নৈতিক উন্নতি ব্যাহত করে ও দেশবাসীর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে আজ দেশে সামরিক শাসন স্থায়ী করার যে কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে তাতে সর্বনাশের পথই সুগম হবে। ক্ষমতার স্বার্থে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ কাজ কারো জন্যই শুভ নয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার অত্যন্ত কষ্টকর সময়ে দেশবাসীর অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে এই সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র অর্জনের স্বপক্ষে। সামরিক ও বেসামরিক যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ

www.pathagar.com

ব্যক্তিস্বার্থে জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সংগঠন আওয়ামী লীগ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুহৃদ সহযোদ্ধা সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকই ক্ষুণ্ন হতে দিতে চায় না; বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে আমারও তা কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে এদেশে সেনাবাহিনী তার যোগ্য মর্যাদা পাবে এই প্রত্যাশা দেশবাসীর সাথে আমারও রয়েছে। সেনাবাহিনী জাতির প্রতিবন্ধক নয়; ক্ষমতালোভীদের উচ্চাভিলাষই হচ্ছে সকল প্রতিবন্ধকতার উৎস। বঙ্গবন্ধু তাঁর সৈনিকদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যেন পাকিস্তানি মনোভাব না আসে।... তোমরা হবে আমাদের জনগণের বাহিনী... তোমরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে। যেখানে অন্যায়-অবিচার দেখবে, সেখানে চরম আঘাত হানবে।' বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অসৎ উদ্দেশ্যে যারা ক্ষমতার উচ্চাশায় উন্মাদ হয়ে সামরিক শাসনের চক্রান্তে জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে বন্দি করেছে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা উদ্ধারে বঙ্গবন্ধুর তিল তিল শ্রমে গড়া সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন সমুন্নত থাকবে, এই প্রত্যাশা আমারও রয়েছে।

রচনাকাল : আগস্ট, ১৯৮৩
প্রকাশিত : আমি তোমাদেরই লোক (সংকলন)

www.pathagar.com

ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড

আল্লাহু আকবর...

...

...

হা ইয়া আলাছ ছালা

হা ইয়া আলাল ফালা

...

...

নামাজের দিকে এসো

কল্যাণের দিকে এসো

মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাচ্ছে—

সে আহ্বান উপেক্ষা করে ঘাতকের দল এগিয়ে এলো ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্য।

গর্জে উঠল ওদের হাতের অস্ত্র। ঘাতকের দল হত্যা করল স্বাধীনতার প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই নরপিশাচরা হত্যা করল আমার মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবকে, হত্যা করল মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শেখ কামালকে, শেখ জামালকে, তাদের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। যাদের হাতের মেহেদির রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেল।

খুনিরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরকে।

সামরিক বাহিনীর কর্নেল জামিলকে যিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দানের জন্য ছুটে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

হত্যা করল কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মকর্তাদের।

আর সব শেষে হত্যা করল শেখ রাসেলকে যার বয়স মাত্র দশ বছর। বার বার রাসেল কাঁদছিল 'মায়ের কাছে যাব বলে'। তাকে বাবা ও ভাইয়ের লাশের পাশ কাটিয়ে মায়ের লাশের পাশে এনে নির্মমভাবে হত্যা করল। ওদের ভাষায় রাসেলকে Mercy Murder (দয়া করে হত্যা) করেছে।

ঐ ঘৃণ্য খুনিরা যে এখানেই হত্যাকাণ্ড শেষ করেছে তা নয় একই সাথে একই সময়ে হত্যা করেছে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনিকে ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনিকে।

হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, তার তেরো বছরের কন্যা বেবীকে।

রাসেলের খেলার সাথী তাঁর কনিষ্ঠপুত্র ১০ বছরের আরিফকে।

জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠসন্তান চার বছরের সুকান্তকে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাংবাদিক শহিদ সেরনিয়াবাত ও নান্টুসহ পরিচারিকা ও আশ্রিতজনকে।

আবারও একবার বাংলার মাটিতে রচিত হল বেঈমানীর ইতিহাস।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেঈমানী করেছিল তাঁরই সেনাপতি মীর জাফর ক্ষমতার লোভে, নবাব হবার আশায়।

১৯৭৫ সালে সেই একই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁরই মন্ত্রিপরিষদ সদস্য খন্দকার মোশতাক। রাষ্ট্রপতি হবার খায়েশে। ঘাতকের দলে ছিল কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহিউদ্দীন, খায়রুজ্জামান, মোসলেম গং। পলাশীর প্রান্তরে যেমন নীরবে দাঁড়িয়েছিল নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির গোপন ইশারায়—

১৯৭৫ এদিনও নীরব ছিল তারা, যারা বঙ্গবন্ধুর একান্ত কাছের, যাদেরকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ্বাস করে ক্ষমতা দিয়েছিলেন— যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তাদের এতটুকু সক্রিয়তা বা ইচ্ছা অথবা নির্দেশ বাঁচাতে পারত বঙ্গবন্ধুকে— খন্দকার মোশতাকের গোপন ইশারায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল তারা, এগিয়ে এল না সাহায্য করতে। মীর জাফরের নবাবি কতদিন ছিল? তিন মাসও পুরো করতে পারেনি— খন্দকার

www.pathagar.com

মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ (যা সংবিধানের স্ব নীতিমালা লঙ্ঘন করে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্জিত) তিন মাসও পুরো করতে পারেনি।

আসলে বেঈমানদের কেউই বিশ্বাস করে না। এমনকি যাদের প্ররোচনায় এরা ঘটনা ঘটায়, যাদের সুতোর টানে এরা নাচে তারাও শেষ অবধি বিশ্বাস করে না। ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়, কিন্তু মানুষ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়?

যুগে যুগে এ ধরনের বেঈমান জন্ম নেয় যাদের ক্ষমতালিপ্সা এক একটা জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। ধ্বংস ডেকে আনে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই খুনিরা হত্যা করেছে।

স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যকে হত্যা করেছে। বাঙালি জাতির চরম সর্বনাশ করেছে।

এই হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে খুনিদের আইনের শাসনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করে পুরস্কৃত করেছে।

আইনের শাসনকে আপন গতিতে চলতে দেয়নি। বরং অন্যায়-অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছে, লালিত করেছে। যার অশুভ ফল আজ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে।

এই খুনিদের বাংলার মানুষ ঘৃণা করে!

বঙ্গবন্ধুকে এরা কেন হত্যা করেছে?

কি অপরাধ ছিল তাঁর?

স্বাধীনতা— বড় প্রিয় একটি শব্দ। যা মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত থেকে দম বন্ধ হয়ে কে মরতে চায়?

একদিন পাকিস্তান কায়েমের জন্য সকলে লড়েছিল। লড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুও। কিন্তু পাকিস্তান জন্মলাভের পর বাঙালি কি পেল? না রাজনৈতিক স্বাধীনতা, না অর্থনৈতিক মুক্তি। বাঙালির ভাগ্যে কিছুই জুটল না, জুটল শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন এবং মায়ের ভাষা মুখের ভাষাও পাকিস্তানি শাসকরা কেড়ে নিতে চাইল। বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি তার মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করল। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবার নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকল।

www.pathagar.com

দেশের সম্পদ পাচার করে বাঙালিকে নিঃস্ব করে দিয়ে বাইশটি পরিবার সৃষ্টি করে শোষণ অব্যাহত রাখল।

আর বঙ্গবন্ধু মুজিব শোনালেন অমরবাণী স্বাধীনতা। দেখালেন মুক্তির পথ।

'এবারের সংগ্রাম— আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম— স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
জয় বাংলা—
ঘোষণা করলেন বাঙালির বিজয়!
জয় বাংলা—
সেই তো তাঁর অপরাধ।

যে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের লীলাক্ষেত্র, জানোয়ারের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিলে যেমন সে হিংস্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি হিংস্র হয়ে উঠল পরাজিত শত্রুরা। কারণ ঐ অমরবাণী ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠল সমগ্র বাঙালির শিরায় উপশিরায়— প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানল বাঙালির চেতনায়।

১৯৭১ এর ৭ মার্চে বজ্রকণ্ঠের অমর সে বাণী যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল প্রতিটি বাঙালিকে। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে পরাজিত করে বাংলার দামাল ছেলেরা ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার লাল সূর্যকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঐ পরাজিত শত্রুদের দোসর নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করল যেন! পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

মুজিববিহীন বাংলাদেশের আজ কি অবস্থা?

বঙ্গবন্ধু মুজিবের সারাজীবনের সাধনা ছিল শোষণহীন সমাজ গঠন। ধনী-দরিদ্রের কোনো ব্যবধান থাকবে না। প্রতিটি মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আহার, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের সুযোগ পাবে।

সারাবিশ্বে বাঙালি জাতির স্বাধীনসত্তাকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। আর সেই লক্ষ্যে সারাজীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন, জেল, জুলুম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য

www.pathagar.com

করেছেন। ফাঁসির দড়িও তাকে তাঁর লক্ষ্য থেকে এক চুলও নড়াতে পারেনি। তাঁর এই আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ স্থানীয়।

কিন্তু আমরা কি দেখি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ঘাতকরা ক্ষান্ত হয়নি— আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান খাটো করা হচ্ছে। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া হলো।

যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করে গণতন্ত্র কায়েম করেছিল বাঙালিরা, সেই গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক জান্তার শাসন কায়েম করল হত্যাকারীরা। সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারাল। ভোট ও ভাতের অধিকার বন্দি হয় সেনা ছাউনিতে।

এদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র লুটেরা গোষ্ঠী। অবাধ লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এদের দুঃশাসনে প্রশ্রয় পেয়েছে দুর্নীতি ও চোরাচালানি।

সামাজিক ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ভোগবিলাস ও মাদকাসক্ত উচ্চ শ্রেণির সৃষ্টি করে অবাধে শোষণ চালাচ্ছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীরা অর্থাৎ এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে।

বঙ্গবন্ধুর আমলে যে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬% তা এখন দাঁড়িয়েছে ১৫%।

ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল ৩৭% এখন প্রায় ৭০%।

২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা দিতে হবে না— বর্তমানে খাজনা ও করের বোঝা অতিরিক্ত। ২২ পরিবারের পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে কয়েক শত পরিবার— অবাধ লুটপাটের লীলাক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ ভাগ, এখন তা দাঁড়িয়েছে ২ ভাগে, আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদেশি পণ্যে দেশ ছেয়ে গেছে, দেশি পণ্য বাজারে বিকোচ্ছে না।

অবাধ চোরাচালানির ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর আমলে মদ, জুয়া, রেস ছিল নিষিদ্ধ, বর্তমানে ঘরে ঘরে মিনি বার বসেছে, বাজারে তো কথাই নেই। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

মাদক চোরাচালানির সুগম পথ আজ বাংলাদেশ। যার বিষাক্ত প্রক্রিয়া সমাজে অশুভ প্রভাব ফেলে কত তাজা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়াচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আজ চরম অবনতি ঘটেছে।

বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবকরা চাকরির অভাবে হতাশাগ্রস্ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অস্ত্রবাজিতে ধ্বংস করা হচ্ছে।

সরকারি মদদে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে।

বাজেটের সিংহভাগ চলে যায় অনুৎপাদনশীল খাতে, আর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যায় সব থেকে কম বরাদ্দ।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। অনাহার অপুষ্টিতে হাজার হাজার মানুষ ভুগছে। বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই তো বর্তমান বাংলাদেশের চেহারা! স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে শুধু একটি মানুষের অভাবে। বাংলার মানুষের এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী ঐ খুনিরা, দায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা।

তাই এই হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করতে হবে। সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান না ঘটলে বাংলার মানুষের মুক্তি আসবে না। গণতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। আজ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবসে প্রতিটি বাঙালিকে শপথ নিতে হবে যে, বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাব। জনতার আদালতে খুনিদের বিচার করব। ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটন করে বাংলার মানুষকে বাঁচাব।

১২ আগস্ট, ১৯৮৯

www.pathagar.com

স্মৃতির দখিন দুয়ার

॥ এক ॥

গতকাল থেকে বারবার ঘোষণা শুনছি আজ রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে। চারদিকে ভোর থেকে হৈ চৈ, জয় বাংলার জয়ধ্বনি। আমরা ধানমন্ডি ১৮ নম্বর রোডের এই বাড়িতে গত আট মাস ধরে বন্দি। সবসময় ঘরের ভেতর থাকতে হয়। বাইরের ধ্বনি ভেসে এলেই রাসেল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে ওঠে 'জয় বাংলা' বলে।

জানি আমাদের এই কণ্ঠধ্বনি এই বন্দিশালার দেয়াল ভেদ করে রাজপথের আনন্দের উল্লাসের স্রোতে মিশবে না; তবু কি মনের এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ চেপে রাখা যায়? সে যেন আজ পাগলপারা নদী! মনের সব আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছে সেদিন বিজয় মিছিলে ছোটাতে গিয়ে বারবার সেই বন্দিশালার চার দেয়ালের আঘাতে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। চোখের কোণ অশ্রুভরা, রাসেলের চাপা আনন্দ। এই বিজয় দিবস কত আকাঙ্ক্ষিত আমাদের জন্য। রাস্তার শেষ মাথায় সাত মসজিদ রোড। সেখান থেকেই বোধহয় মিছিলের মানুষের ধ্বনি ভেসে আসছে। আমরা এই বন্দিশালা থেকে কখন মুক্ত হবো— কখন ঐ বিজয় মিছিলে যাব সবার সাথে? আমরা কি পারব মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে? স্বাধীনতা আমার, আমার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার স্বাদ কি আমরা পাব না?

গত কয়েকদিন ধরে আকাশে বিমান যুদ্ধ হচ্ছে। কোথাও হয়তো বোমা পড়ছে— তার প্রচণ্ড শব্দের হালকা আভাস পাচ্ছি। তোপের শব্দের মতো থেমে থেমে আওয়াজও পাচ্ছি। রেডিওতে আত্মসমর্পণের খবর শুনছি। কোথাও দূর থেকে ভেসে আসছে— জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। চারদিক মুখরিত ধ্বনি, গাড়ির শব্দ আর মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ। বিজয়ের

www.pathagar.com

উল্লাসে মেতেছে যেন ঢাকা নগরী। মন ছুটে যেতে চাচ্ছে ইয়াহিয়ার বন্দি আগল ভেঙে ঐ বিজয় মিছিলে। বাঙলার আকাশ-বাতাস যেন পৌষের শীতের শিশির ভেজা। বারুদের গন্ধে ভারি হয়ে আছে।

দীর্ঘ নয়টি মাস দেশটা শত্রুর কবলে ছিল, শুধু আর্তচিৎকার, গুলির শব্দ, আর মৃত্যুর শোক মানুষের জীবনকে অর্ধমৃত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিল। সে যেন এক দুর্বিষহ অবস্থা। নিশুতি রাতের কুকুরের করুণ কান্না, জলপাই রং মিলিটারি জিপ বা ট্রাকের আওয়াজ। হঠাৎ করে গুলির শব্দ বা গ্রেনেড ফোটার আওয়াজ— বস্তির ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে, তার হালকা আভা ও ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাওয়া; অসহায় নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার— এই তো ছিল ঢাকা শহরের প্রতিদিনের দৃশ্য।

সমগ্র দেশটাই ছিল এক বন্দিশালা। এরই মাঝে জীবনের ধ্বনি যেন পাওয়া যেত, যখন শোনা যেত কোনো মুক্তিযোদ্ধার গুলি বা বোমার শব্দ— মিলিটারি মারার খবর। তাদের যেকোনো আক্রমণ বা গ্রেনেড ফোটার বিকট শব্দ হলে শত্রুপক্ষ সন্ত্রস্ত হতো— মনে হতো আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব, আমাদের অস্তিত্ব এখনও আছে। অমৃতের বরপুত্র এই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের যেন নতুন করে জীবনদান করে যেত!

গত কয়েক দিন থেকে সীমাহীন দুর্দশায় কাটছে আমাদের। মৃত্যুর মুখোমুখি যেন। যখন-তখন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ওরা হাজির হতে পারে। সারাদিন, সারারাত এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্য দিয়ে কাটাতে হচ্ছে। আব্বা কি বেঁচে আছেন? কোথায় কি অবস্থায় আছেন কিছুই জানি না। কামাল, জামাল, নাসের কাকা, মনি ভাইসহ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আওয়ামী লীগের, ছাত্রলীগের সবাই তো মুক্তিযুদ্ধে। কে আছে, কে নেই, কোনো খবর জানা নেই। যদিও এই বন্দিদশার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ ছিল, কয়েকদিন থেকে তাও একেবারেই বিচ্ছিন্ন। চারদিকে এত প্রতিধ্বনি— রেডিওতেও শুনেছি দেশের প্রায় সব এলাকা স্বাধীন, মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে।

ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যদের সাথে তারা এখন ঢাকার পথে মার্চ করে চলেছে। আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী, ছাত্রলীগের সাথীরা কে কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে জানি না।

এদেশের ছাত্র, জনতা, কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী ও সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নেমেছে— কে যে ঘরে ফিরবে আর কে যে চিরতরে হারিয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। কার মুখ দেখব,

www.pathagar.com

কার মুখ দেখব না কে জানে? দেশ জুড়ে ন'টা মাস যেন এক হিংস্র হায়েনার স্বেচ্ছাচার তাণ্ডবলীলা চলেছে। মানুষ হত্যা, বস্তি পোড়ানো, গ্রাম উজাড়, নারীধর্ষণ এই নিষ্ঠুরতার কোনো সীমা ছিল না। মানবিক জ্ঞান লোপ পেলে কি এমনই হিংস্র হয়ে ওঠে মানুষ? ওরা তো মানুষ নয়— অমানুষ, সভ্যজগতে এদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই? দেশের সাধারণ মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সংগ্রামে শরিক হয়ে জীবন দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে। আর কিছু বেঈমান, আলবদর রাজাকার, শত্রুবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু সব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে বাঙালি আজ উড়িয়েছে তার সাহসী ঝড়ের কেতন। আজ এসেছে বিজয়ের দিন। কিন্তু হায়! আমরা তো রুদ্ধদ্বার, মুক্তপ্রাণ!

আমরা যে বাড়িটাতে বন্দি ছিলাম তার ছাদের উপর দুদিকে দুটো বাঙ্কার করে মেশিনগান বসান হয়েছে। এছাড়া আর একটা বাঙ্কার গ্যারেজের ছাদে করা হয়েছে। বাগানের মাটি কেটে ট্রেঞ্চ খোদা হয়েছে। দিনরাত গুলির আওয়াজ। যখন বিমান আক্রমণ হয় তখন সব সৈন্য ট্রেঞ্চে ঢুকে যায় এবং বাঙ্কারে গিয়ে দাঁড়ায়। কেবল আমরা যারা বন্দি আমাদের মৃত্যু প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে হয়। চার মাসের জয়কে নিয়ে হয়েছে অসুবিধা। বিছানায় শোয়ানো যায় না, গুলির আওয়াজে কেঁপে ওঠে। রাসেলের পকেটে তুলো রাখে। ওর কানে তুলো গুঁজে দেয়, যাতে গুলির আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে না যায়।

রাসেলকে নিয়ে হয়েছে আরও মুশকিল। বিমান আক্রমণ শুরু হলেই সে ছুটে বারান্দায় চলে যেতে চায় অথবা সোজা মাঠে যেতে চায় বিমান দেখতে। অনেক কষ্টে ওকে ধরে রাখতে হয়। কিছুতেই বোঝানো যায় না। মা, রেহানা, আমি যে যখন পারি ওকে আটকে রাখতে চেষ্টা করি। ঘরের ভিতরে মাদুর পেতে মাটিতে সকলকে নিয়ে বসে জানালা দিয়ে বিমান যুদ্ধ দেখি। আর প্রতীক্ষায় থাকি কখন শত্রুমুক্ত হবে দেশ। এভাবেই কয়েকটি দিন আমরা কাটিয়েছি।

আজ পাক-হানাদার বাহিনী আত্মসমপর্ণ করবে। সকাল ১১টা পর্যন্ত সংবাদ পেলাম ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ঢুকে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল, বিজয়োল্লাস। আমরা বাড়িতে বন্দি কয়টি প্রাণী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যেন প্রহর গুনছি।

www.pathagar.com

ঢাকা শহর মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গাড়ি নিয়ে বাসার সামনে দিয়ে যাতায়াত শুরু করল, অনেকেই আমাদের খোঁজ-খবর নিতে বা বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রহরীরা কাউকেই প্রবেশ করতে দিল না। বরং দুপুরের পর থেকে ঐ রাস্তা দিয়ে যারাই গাড়ি নিয়ে যাতায়াত শুরু করল তাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। এ দিকে রেডিওতে সারেন্ডার করবার ঘোষণা শুনছি আর আমাদের এখানে সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা ঘটছে। 'মা হাবিলদারকে ডেকে বললেন? তোমাদের নিয়াজী সারেন্ডার করেছে, তোমরাও করো।'

ওর সোজা উত্তর 'নিয়াজী কর সকতা হ্যায়, হাম নেহি করেঙ্গে। হামারা পাস এতনা তাগত হ্যাঁয় কে হাম এক ব্যাটালিয়ান কো রোক সকতা।' অর্থাৎ, নিয়াজী সারেন্ডার করতে পারে কিন্তু আমরা করব না। আমাদের যে শক্তি আছে তা দিয়ে এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যকে বাধা দিতে পারব।

তাদের গুলি চালানো অব্যাহত রইল। নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা সামসুজ্জোহা গাড়ি নিয়ে ১৮ নম্বর রাস্তায় প্রবেশ করতেই তাঁর গাড়ি লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া হল। তিনি আহত হলেন। কোনোমতে গাড়ি নিয়ে রাস্তা পার হলেন। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

এরা যদি রাস্তার দুই প্রবেশমুখ বন্ধ করে দেয় তাহলে আর কোনো গাড়ি ঢুকতে পারে না। সেটা না করে যারাই আসছে তাদেরই উপর মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সকলেই জানে আমরা এখানে বন্দি। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সকলেই ভাবছে আমরা মুক্তি পাব। কাজেই দেখা করতে আসছে। মনের আবেগ-উল্লাস তাদের এ পথে নিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে যে পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। আমরা ঘরের ভেতর নীরব সাক্ষী হয়ে সব দেখছি। খবর পাঠাবারও উপায় নেই। ঘরের বাইরেও যেতে দিচ্ছে না।

ইঞ্জিনিয়ার হাতেম আলী সাহেব ৩২ নম্বর সড়কে আমাদের পড়শি হিসেবে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। তাছাড়া তিনি আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হন।

পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েই প্রথমে এই রাস্তায় আমাদের এক নজর দেখতে এসেছিলেন। গাড়ি যখন এই রাস্তায় ঢোকে মনে দ্বিধা ছিল কিন্তু মনের আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। ঠিক গেটের সামনে আসতেই ছাদ থেকে মুষলধারে মেশিনগানের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে শুরু করল। ড্রাইভার তার জায়গায় মৃত্যুবরণ করল। হাতেম আলী

www.pathagar.com

সাহেবের স্ত্রীর হাতে গুলি লাগল। তাঁর পুত্রবধূর মাথার চামড়ায় গুলি লাগল। পানি পানি বলে আর্তচিৎকার শুনে আমরা ঘর থেকে বারান্দায় ছুটে আসতেই আমাদের দিকে রাইফেল তাক করে ওরা 'আন্দার যাও, কুছ নেহি হুয়া— ভেতরে যাও কিছু হয়নি' বলে আমাদের ভেতরে পাঠিয়ে দিল। আশে-পাশের বাড়ি থেকে অনেকেই সাহায্যের জন্য ছুটে আসতে চাইল। ছাদ থেকে সোজা গুলি চালাল তার উপর গাড়ি হঠাও বলে চিৎকার। গাড়ির ভেতরের আরোহীরা কোনো মতে গাড়ি ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল। ফোটায় ফোটায় রক্ত রাস্তায় পড়তে লাগল। আমরা অসহায় বন্দি, জানালা দিয়ে সব দৃশ্য শুধু দেখে গেলাম। কালের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

রেডিওতে আত্মসমর্পণের খবর শুনছি। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। মিত্রবাহিনী ভারত ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষে জেনারেল অরোরা উপস্থিত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসর্মপণ করালেন। রেসকোর্সে স্বাধীন বাংলার পতাকা বিজয়ের স্বাক্ষর বহন করে উড়ল।

এই রেসকোর্স যেখানে মাত্র দশ মাস আগে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে আমাদের মহান নেতা এই যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক, শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' শুনিয়েছিলেন সেই অমরবাণী 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই সংগ্রামে আজ বাঙালি জাতি বিজয়ী। সেই রেসকোর্স ময়দানেই শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে। আমাদের চির অবহেলিত বাংলা মায়ের সন্তানেরা বুকের রক্ত দিয়ে আজ বিজয় তিলক এঁকে দিল বাংলা মায়ের ললাটে।

কি আনন্দ, কি উল্লাস— চোখে অশ্রু, মুখে হাসি, কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি প্রকম্পিত করছে ঢাকা শহর তথা গোটা বাংলাদেশকে। আর আমরা? আমরা নরকে বসে দেখছি হায়েনার শেষ কামড়, শেষ উল্লাস। আমাদের বন্দিশালা তখনো স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত, তার উপর তখনও পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে কাদেরিয়া বাহিনীর একটি খোলা জিপ ব্যানারসহ স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিল। উপর থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ল ওরা। রাস্তা থেকে পাল্টা গুলি এল। তাই দেখে রেহানা মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী বলে জানালায় উঠে হাততালি দিতে শুরু করল আর জয় বাংলা বলে স্লোগান দিল। তাড়াতাড়ি ওকে বকা দিয়ে জানালা

www.pathagar.com

থেকে নামালাম। কখন ক্রস ফায়ারে পড়ে যায় ঠিক নেই। রাসেল, খোকা কাকা, রেহানা, মা ও আমি জয়কে পালা করে কোলে নিয়ে সময় কাটাচ্ছি।

ওদিকে বুয়া বৃদ্ধা মানুষ। কানেও শোনে না ভালো করে, তার প্রশ্নের শেষ নেই। রমা ও আবদুল ওরাও বয়সে কম। কখন বাসার বাইরে যেতে পারবে, মিছিলে শরিক হতে পারবে সেই প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। ধীর ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ওদের গোলাগুলিও বাড়ছে। এই রাস্তা দিয়ে যে কয়টা গাড়ি যাচ্ছে তাতেই সরাসরি গুলি করেছে।

একটা গাড়িতে গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে 'বাবারে' বলে চিৎকার শুনলাম। গাড়িটা বাসার কোনায় থেমে গেল। তখনও বাতি জ্বলছে। বেশ কিছুক্ষণ গুলি চালাবার পর ওরা চিৎকার শুরু করল 'বাত্তি বন্ধ কর— বাত্তি বন্ধ কর' অর্থাৎ বাতি বন্ধ কর। কিন্তু কে করবে? যে করবে তাকে তো গুলি করে হত্যা করেছে, সে খেয়াল নেই। সারারাত গাড়িটা বাতি জ্বালান অবস্থায় পড়ে থাকল। একের পর এক গাড়ি এসেছে আর গুলি চালিয়ে, মানুষহত্যা করছে। আমাদের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলছে। আমরা বন্দি কয়টি প্রাণী শুনছি গুলির শব্দ আর আর্তচিৎকার। সারারাত এভাবেই কাটল।

খুব ভোরের দিকে গোলাগুলি থামল। খবর নিয়ে জানলাম হাবিলদার সাব 'নিন্দ পড়া' অর্থাৎ ঘুমুচ্ছেন।

আজ ১৭ ডিসেম্বর। সারারাত গুলি চালাবার পর একটু বিরতি। রমা এসে বলল, গেটে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক এসেছিল, পাকসেনারা ওদের ঢুকতে দেয়নি। হাবিলদারটা ঘুমুচ্ছে তাই রক্ষে, নইলে ঠিক গুলি চালিয়ে দিত।

এর মধ্যেই দেখলাম ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে এবং পাকসেনাদের সারেন্ডার করবার জন্য চাপ দিচ্ছে। হাবিলদারকে ঘুম থেকে তোলা হল। সে কিছুতেই নমনীয় হবে না। আমরা সব সামনের কামরায় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে গেট খুব কাছে, অনেক বাক-বেতণ্ডার পর পাকসেনারা সারেন্ডার করতে রাজি হল। তবে দুঘণ্টা সময় চায়। আমরা ভেতর থেকে প্রতিবাদ করলাম। মেজর অশোক নেতৃত্বে ছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁকে চিৎকার করে বললাম, ওদের যদি দুঘণ্টা সময় দেওয়া হয় তাহলে ওরা আমাদের হত্যা করবে। কাজেই ওরা যেন কিছুতেই চলে না যায়। আমাদের অনুরোধে ওরা ওদের অবস্থান নিয়ে থাকল এবং পাক-সেনাদের আধঘণ্টা সময় দিল।

এত দুঃখের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে হাসি চেপে রাখা যায় না। গেটে যে সেন্ট্রি দুজন ছিল ওরা দারুণভাবে কাঁপতে শুরু করল। এদিকে আমার মা জানালা দিয়ে ওদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। ওর মধ্যে একজনের নাম ছিল পায়েন্দা খাঁ। মা ওকে নাম ধরে ডেকে সারেন্ডার করতে হুকুম দিলেন। সে কাঁপতে কাঁপতে পাশের ট্রেঞ্চে ঢুকে গেল। ওর সাথী আগেই ট্রেঞ্চে ঢুকে বসেছিল।

দরজা উন্মুক্ত। আমরা সব ঘর থেকে ছুটে বারান্দার চলে এলাম, ওরা সব অস্ত্র ফেলে দিয়ে একে একে সারেন্ডার করে গেল। মা সঙ্গে সঙ্গে আবদুলকে হুকুম দিলেন পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলতে। পতাকাটি নামিয়ে মার হাতে দিতেই মা ওটাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে শুরু করলেন। তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুই পাশ থেকে জনতার ঢল নামল। সাংবাদিকরা ছুটে এলেন। মুক্ত হবার আনন্দের কান্নায় আমরা সবাই ভেঙে পড়লাম।

চোখে অশ্রু, মুখে হাসি, কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি, মনের সবটুকু আবেগ দিয়ে শ্লোগান দিয়ে চলছি— আর প্রতীক্ষায় কাল গুনছি। কখন আপনজনদের কাছে পাব। এ প্রতীক্ষা কেবল আমার নয়, প্রতিটি বাঙালির। তাদের নয়নের মণি মুজিবকে তারা কবে ফিরে পাবে। বিজয়ের এই আনন্দ তবেই তো পূর্ণতা লাভ করবে।

[একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের স্মৃতি থেকে]

১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামখানি একসময় মধুমতি নদীর তীরে ছিল। বর্তমানে মধুমতি বেশ দূরে সরে গেছে। তারই শাখা হিসেবে পরিচিত বাইগার নদী এখন টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে কুল কুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে নদীর পানি রুপোর মতো ঝিকমিক করে।

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারি সারি খেজুর, তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ-কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতা-পাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখির কল-কাকলি, ক্লান্ত-দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণ রকম ভালোলাগার একটুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এই টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল-সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।

আমাদের বসতি প্রায় দুশো বছরের বেশি হবে। সিপাহী বিপ্লবের আগে তৈরি করা দালান-কোঠা এখনও রয়েছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে বসবাস করেন। তবে বেশিরভাগ ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে এখন সাপের আখড়া। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক গোলমাল হতো। মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গেও গণ্ডগোল লেগেই থাকতো। একবার এক মামলায় এক ইংরেজ সাহেবকে হারিয়ে জরিমনা পর্যন্ত করা হয়েছিল। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে সেই ভাঙ্গা দালান এখনও বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-সেনাবাহিনী ঐ দালানের ওপর হামলা চালিয়েছিল।

www.pathagar.com

আমার দাদা-দাদিকে সামনের রাস্তায় বসিয়ে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আমাদের গ্রামে ঢাকা থেকে স্টিমারে যেতে সময় লাগতো সতেরো ঘণ্টা। রাস্তাঘাট ছিলই না। নৌকা ও পায়ে হাঁটা পথ একমাত্র ভরসা ছিল। তারপরও সেই গ্রাম আমার কাছে বিরাট আকর্ষণীয়। এখন অবশ্য গাড়িতে যাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে স্পিডবোটেও যাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া নৌকায় যেতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে।

আমার শৈশবের স্বপ্ন-রঙিন দিনগুলো কেটেছে গ্রাম-বাংলার নরম পলিমাটিতে, বর্ষার কাদা-পানিতে, শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে, ঘাসফুল আর পাতায় পাতায় শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে, জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক শুনে, তাল-তমালের ঝোপে বৈচি, দিঘির শাপলা আর শিউলি-বকুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে, ধুলোমাটি মেখে, বর্ষায় ভিজে খেলা করে।

আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করতেন। বেশিরভাগ সময় তাঁকে তখন জেলে আটকে রাখা হতো। আমি ও আমার ছোট ভাই কামাল মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দাদা-দাদির কাছে থাকতাম। আমার জন্মের সময় বাবা কলকাতায় পড়তেন, রাজনীতি করতেন। খবর পেয়েও দেখতে আসেন বেশ পরে।

আমার বাবা যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন একবার বাড়ি এলে আমরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে নড়তাম না। বাবার কোলে বসে গল্প শোনা, তার সঙ্গে খাওয়া, আমার শৈশবে যতটুকু পেয়েছি তা মনে হতো অনেকখানি।

বাবাকে একবার গোপালগঞ্জ থানায় আনা হলে দাদার সঙ্গে আমি ও কামাল দেখতে যাই। কামালের তো জন্মই হয়েছে বাবা যখন ঢাকা জেলে। ও বাবাকে খুব কাছ থেকে কখনও দেখেনি। আমার কাছেই বাবার গল্প শুনত মুগ্ধ হয়ে। গোপালগঞ্জ জেলখানার কাছে পুকুরপাড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাবাকে নিয়ে যাবে কোর্টে তখনই আমরা দেখব। কামাল কাছ ঘেঁষে বলল : হাচুপা, তোমার আব্বাকে আব্বা বলতে দেবে। আমার শৈশবের হৃদয়ের গভীরে কামালের এই অনুভূতিটুকু আজও অম্লান হয়ে আছে। বাবাকে আমাদের শৈশবে-কৈশোরে খুব কমই কাছে পেয়েছি। শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলাম বলে দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের মানুষের অশেষ স্নেহ-মমতা পেয়েছি।

www.pathagar.com

আমাদের পরিবারের জন্য মৌলভি, পণ্ডিত ও মাস্টার বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বাড়ির সব ছেলেমেয়ে সকাল-সন্ধ্যা তাঁদের কাছে লেখাপড়া শিখতাম। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেও কিছুদিন পড়শোনা করেছিলাম। আমার কৈশোরকাল থেকে শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯৫২ সালে আমার দাদার সঙ্গে স্নেহময়ী দাদা-দাদি ও আত্মীয়-স্বজন বেশিরভাগ গ্রামে বাস করতেন। স্কুল ছুটি হলে বা অন্যান্য উৎসবের বছরে প্রায় তিন-চারবার গ্রামে চলে যেতাম। আজও আমার গ্রামের প্রকৃতি, শৈশব আমাকে ভীষণভাবে পিছুটানে।

আমার শৈশবের দিনগুলো ভীষণরকম স্মৃতিময়। আজ সেসব দিনের কথা যেন স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে বার বার ভেসে আসছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছর বড় হবে। সেই ফুপুর সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছি। খালের ওপর ছিল বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিন কি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। আমার হাত-পা কাঁপছিল, ফুপুই আমাকে সাহস দিয়ে হাত ধরে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিল। এরপর কখনও ভয় করেনি। বরং সবার আগে আমিই থাকতাম।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা পুঁটি খল্লা মাছ ধরা খুবই আনন্দের ছিল। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসতো। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসতো কই ও বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষেবাঁটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আমমাখা পুরে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এই আমমাখা পুরে যে না খেয়েছে, সে কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আমমাখা পুরলে তার ঘ্রাণই হতো অন্য রকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারমারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরুই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড় তালাবের (পুকুর) পাড়ে

www.pathagar.com

ছিল বিরাট এক বরুই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরুইটা পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারো পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না, তখন সেই বরুইটার জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনও ভুলতে পারলাম কই?

পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার দাদার একটি বড় নৌকা ছিল। যার ভেতরে দুটো ঘর ছিল, জনালাও ছিল বড় বড়। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। নৌকার জানালায় বসে নীল আকাশ আর দূরের ঘন সবুজ গাছ-পালা ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নৌকা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সেই গ্রাম আমার কাছে এখনও যেন সুভাষিত ছবির মতো।

আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর পাশেই আমার দাদা-দাদির কবর—যারা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তারা মিশে আছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয়-পরিজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায় তাদের বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীনসত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সেই মহাপুরুষকে নিভৃত পল্লির মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে— কিন্তু পেরেছে কি?

বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগও পেতাম। তাঁর একটা কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন 'শেষজীবনে আমি গ্রামে থাকব। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকব।' কথাগুলো আমার কানে এখনও বাজে। গ্রামের নিঝুম পরিবেশে বাবার মাজারের এই পিছুটান আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বার বার আমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আমি এখন নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে নিয়েছি। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গিপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর

www.pathagar.com

ধারে একটা ঘর তৈরি করার। আমার বাবা-মার কথা স্মৃতিকথামূলকভাবে লেখার ইচ্ছে আছে। আমার বাবা রাজনীতিবিদ মুজিবকে সবাই জানতেন। কিন্তু ব্যক্তি মুজিবও কত বিরাট হৃদয়ের ছিলেন, সেসব কথা আমি লিখতে চাই।

গ্রামকে তো আমি আমার শৈশবের গ্রামের মতো করেই ফিরে পেতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর হবে না। এখন সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যান্ত্রিকতার স্পর্শে গ্রামের সরল-সাধারণ জীবনেও ব্যস্ততা বেড়েছে, চমক জেগেছে। মানুষও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীতে বাস করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গ্রামীণ-জীবনের মানোন্নয়ন ও শ্রমের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

আমার শত ব্যস্ততা থাকলেও এবং একটু সময় পেলেই আমি চলে যাই। কেন যে মনে হয় আমার শৈশবের গ্রামকে যদি ফিরে পেতাম! গ্রামের মেঠোপথটা যখন দূরে কোথাও হারিয়ে যায় আমার গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে... ।'

শৈশব ও কৈশোরের স্কুলপাঠ্য বইয়ের গ্রাম সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমার খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেতো। 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর', 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়', 'বহুদিন পরে মনে পড়ে আজ পল্লী মায়ের কোল', 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ', 'মেঘনা পারের ছেলে আমি', 'ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা', 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে'— এসব কবিতার লাইন এখনও মনে আছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বারে পাঠিকা হিসেবে যখন আমি প্রবেশ করি, তখন তো আমি কিশোরী। পরে হয়েছিলাম ছাত্রী। গ্রামভিত্তিক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা যখনই সুযোগ পেয়েছি পড়েছি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আমাকে প্রথম ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে। এখনও হাতের কাছে পেলে পাতা ওল্টাই। দুর্গা ও অপু দু'ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, খুনসুটি, গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো, কিছু পেলে ভাগাভাগি করে খাওয়া, অপুর প্রতি দুর্গার কর্তব্যবোধ, দুর্গার অসুখ ও মৃত্যু। অপুর দুঃখ ও দিদিকে হারানোর বেদনা, বুড়ি ঠাকুরমা'র অভিমান, দুঃখ-ব্যথা, অসহায়ত্ব। অপুর

www.pathagar.com

মা সর্বজয়া, দুঃখ-দারিদ্র্য যার নিত্যসঙ্গী, জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যার সংগ্রাম, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা। অপু-দুর্গার বাবার প্রবাস চাকরি জীবন, দুর্গার মৃত্যুর পর তার জন্য বাবার আনা শাড়ি, এসব ছোট্ট ছোট্ট দুঃসময় বাস্তবজীবনের বহু খণ্ড খণ্ড চিত্র তো বাংলাদেশের গ্রাম জুড়ে আজও রয়েছে। 'পথের পাঁচালী' আমার নিজের গ্রামকেই মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পগুলোও আমার ভীষণ প্রিয়। গ্রামকে নিয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদিনের স্কেচগুলোও বাস্তব। কলাগাছের ঝোপে নোলক পরা বউয়ের ছবিটি এখনও মনে পড়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও মোটেই অনুল্লেখ করার মতো নয়। বাউল গান, বৈষ্ণব গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মাঝির গান— এসবই আবহমান কালের গৌরব।

গ্রামই আমাদের জীবন। আলোকোজ্জ্বল আধুনিক রাজধানী ও শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ-অর্থনীতি আর মানুষ। ছোট-বড় সব গ্রামকেই আমাদের ঐতিহ্য অনুসারী আধুনিক ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক সরঞ্জামসহ হাতপাতাল, স্কুল, মাতৃসদন, কৃষি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র, খেলার মাঠ প্রভৃতি থাকবে। ঘরবাড়ির অবস্থা মজবুত ও পরিচ্ছন্ন হবে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পাকা হবে, যানবাহন চলাচলে সুব্যবস্থা করে শহরের সঙ্গে যোগযোগ সহজতর করে তুলতে হবে।

কৃষিজমিগুলো সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করে কৃষিব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টনসহ উৎপাদিত শস্য যাতে নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাত করা হয় ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম থেকে উৎপাদিত খাদ্যশস্য সহজপ্রাপ্য করে তুলতে হবে। যেসব উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি হবে ও কাঁচামাল হিসেবে কারখানায় যাবে তার সুষ্ঠু সরবরাহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। কৃষিকাজকে আধুনিকীকরণ করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। সারাবছর ধরে মৌসুমানুযায়ী সকল প্রকার ফসল দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন করতে হবে। কোনো জমি পতিত পড়ে থাকবে না। নদ-নদী, খাল-বিল, দিঘি-পুকুরে মৎস্যচাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

www.pathagar.com

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি লক্ষ্য রেখে খামার গড়ে তুলতে হবে। সারাবিশ্বে আজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন হচ্ছে। আমাদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় জমাবে না। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ও কৃষি উপকরণ সহজপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে সারাবছর কর্মব্যস্ত রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারী গ্রামীণ কুটির-শিল্পের মানোন্নয়ন করে ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্য ও ছোট-বড় সকল ব্যবসা এবং শিল্পবিকাশের পথ করে দিতে হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। আমি মনে করি আধুনিক বা যুগোপযোগী কৃষিব্যবস্থাই আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। এই সঙ্গে যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত হয়ে আসা অবহেলিত কৃষকদের পোড়খাওয়া দুর্ভিক্ষ— দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভাগ্যকেও পরিবর্তিত করে তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের গ্রামের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বেড়াজাল ভেঙ্গে তাদের মেধাবিকাশের পথ করে দিতে হবে। তাদের শ্রমশক্তিকেও সমমর্যাদায় উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা নানারকম অনাচার-অবিচারের শিকার হয়ে থাকে। মেয়েরা সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ পেলে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালে মননে-ব্যক্তিত্বে সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলে কোনো প্রকার নির্যাতন বা শোষণ তাদের অন্তরায় হয়ে থাকবে না। নিজের অধিকারও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মেয়েদেরই শক্তহাতে নিতে হবে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে হবে।

গ্রামের উন্নতিকল্পে আরও একটি বিষয় আমাকে ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। সেটা হলো, আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত অসহায় অংশ পুষ্টিহীন কঙ্কালসার শিশুর সংখ্যাধিক্য। দেশের সর্বত্র আমি যে গ্রামেই গিয়েছি এই একই চেহারার শিশুদের দেখেছি। এসব শিশু যখন জন্ম নিচ্ছে, তখন অবশ্যই তাদের ভবিষ্যৎকে সম্ভাবনাময় ও নিরাপত্তাপূর্ণ করে তুলতে

www.pathagar.com

হবে। তাদের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকে আনন্দময় ও সুখময় করে তোলার উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। তাদের সচ্ছল-সমৃদ্ধময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও আমাদের বর্তমানকে তাদের জন্য উৎসর্গ করার দৃঢ় মানসকিতা গ্রহণ করা উচিত। এবং সেই সঙ্গে সকলকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সক্ষম জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে।

গ্রামের উন্নয়নপ্রক্রিয়া বলতে আমি কোনো ছিঁটেফোঁটা বা সাময়িক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই। যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে পড়ে থাকা পশ্চাৎপদ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সামগ্রিক সংস্কার করে আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আমি কোনো অনুদানমূলক বা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উন্নয়ন নয়, 'টোটাল' বা 'সামগ্রিক' উন্নয়ন চাই। এজন্য প্রয়োজনবোধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষিত সচেতন তরুণ সমাজকে কাজে নামাতে হবে।

গ্রাম-জীবনের অসংখ্য চরিত্র আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের গ্রামের আক্কেলের মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। বুড়ি হয়ে গেছে এখন। তিন ছেলে তার। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। গ্রামের সব পাড়ায়, ঘরে ঘরে তার অবাধ যাতায়াত। সব ঘরের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে। সে যেন গ্রামের গেজেট। কার ঘরে রান্না করতে হবে, পিঠে বানাতে হবে— সব কাজে আক্কেলের মা হাজির। আমরা যখনই গ্রামে যেতাম পিঠা তৈরি বা তালের ফুলুরি বানাতে তার ডাক পড়ত। পথে যেতে তার ঘরে একবার ঢুঁ মারলে পিঁড়ি পেতে বসাবেই, পান-সুপারিও খাওয়াবে।

ধানকাটার মৌসুমে দক্ষিণ দিক থেকে অনেক লোক আসত। 'পরবাসী' নামে তারা পরিচিত। ধানকাটা, মাড়াই প্রভৃতি কাজ তারা করত। ছোট্ট খুপরি ঘর তুলে পুরো মৌসুমটা থাকত। ধান তোলা হলে নিজ নিজ অংশ নিয়ে তারা চলে যেত। বর্ষার মৌসুমে নৌকায় করে বেদেনীরা আসত। রং-বেরঙের কাঁচের চুড়ি আমাদের হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত। ফিতে, আলতা, চিরুনি, আয়না, নানা ধরনের খেলনা ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বছরের নির্ধারিত সময়টিতে তারা ঠিক সময়মতো চলে আসত। আবার কখনও সাপের খেলা দেখাত, বাঁশি বাজিয়ে কত রকম গান শোনাত। গ্রামের বৌ-ঝিরা তাদের কাছে ভিড় জমিয়ে দেশি টোটকা ওষুধ নিত।

www.pathagar.com

ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি কত প্রকার তাবিজ তারা দিয়ে যেত সবাইকে। বিনিময়ে ধান-খুদ বা সবজি-ডিম-মুরগিও নিত।

গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র জীবনের চরিত্র রয়েছে। দু'মুঠো অন্নের আকাঙ্ক্ষায় যে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, চৈত্রের রোদে পুড়ে রুক্ষ ক্ষেতে লাঙ্গল টানে, বর্ষায় বুক-সমান পানিতে ডুব দিয়ে পাট কাটে, শীতের প্রচণ্ড কাঁপুনি সহ্য করে ফসল কাটে— তার জীবনসংগ্রাম কি অন্য যেকোনো সংগ্রামের চেয়ে কম মূল্যবান?

আমি জানি আমার গ্রামের সেই সুন্দর দিনগুলো আর কখনও ফিরে আসবে না। একে একে সব হারিয়ে গেছে। আমার সেই চিরচেনা গ্রাম, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত সেই মানুষগুলোও নেই। নেই মানুষের সেই মন-জীবন। যুদ্ধে সবাই যেন আজ পরাজিত। সেই কোমল সত্তারও মৃত্যু ঘটেছে। আজ শুধু বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। আর তাই বেড়েছে স্বার্থপরতা, সংঘাত। হারিয়ে গেছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংকুচিত হয়েছে প্রসারিত হাত। জানি না এর শেষ কোথায়।

আমার জন্ম হয়েছে গ্রামে, শৈশবে রঙিন দিনগুলো উপভোগ করেছি গ্রামে। গ্রামীণ স্বভাব, চালচলন, জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। এখনও একটু সময় ও সুযোগ পেলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি বলেই গ্রামে চলে যাই। শহরের যান্ত্রিক ব্যস্ততম জীবন থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের নিরিবিলি নিঝুম শান্ত প্রকৃতিতে গেলে আমার দু'চোখে শান্তির ঘুম নেমে আসে। রাজধানীতে এমন ঘুম পাওয়া কষ্টকর। এখানে বাতাস খুব ভারি, শ্বাস নিতেই তো কষ্ট। রাতের তারাভরা খোলা আকাশ অনেক বড় সেখানে। নিম, কদম, তাল-নারিকেল গাছের পাতা ছুঁয়ে ছন্দময় শব্দ তুলে ছুটে আসে মুক্ত বাতাস। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' যেন আমার গ্রাম— ঘন সবুজ প্রকৃতি ও ফসলের প্রান্তর দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। নির্জন দুপুরে ভেসে আসে ঘুঘু আর ডাহুকের ডাক, মাছরাঙাটা টুপ করে ডুব দিয়ে নদী থেকে ঠিকই তুলে আনতে পারে মাছ। এর চেয়ে আর কোনো আকর্ষণ, মোহ, তৃপ্তি আর কোনো কিছুতেই নেই আমার। ধূলি-ধূসরিত গ্রামের জীবন আমার আজন্মের ভালোবাসা। আমার হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি।

রচনাকাল : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
প্রকাশিত : সাপ্তাহিক রোববার

www.pathagar.com

স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার

অনেক রাত হবে। দোতলায় মায়ের ঘরে খাটে আমরা সবাই। মা, আব্বা, ভাই-বোন কেউ শুয়ে, কেউ বসে খুব গল্প করছি। আব্বাও অনেক কথা বলছেন, আমরা শুনছি। সেই আগের মতো ৩২ নং বাড়িটায় সবাই আছি। বাড়িটা একদম বিধ্বস্ত। এখানে ওখানে গুলির দাগ। আমার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে আলনা ও একটা আলমারি রাখা আছে। বড় একটা আয়না রয়েছে। ঐ আয়নায় গুলি করেছে ফলে অর্ধেক আয়না ভেঙে গেছে। বাড়ির ইটগুলি অনেকখানি বেরিয়ে আছে। এদিকে দরজায় একটা শাড়ি ছিঁড়ে দু'টুকরো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মায়ের কোলের কাছে শুয়েছিলাম আমি। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম...

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগল যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। কেন যেন মনটাই ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্নটা পুরো দেখা হল না। ফোনটার উপরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখেছি যে সেই আগের মতো সবাই একসঙ্গে ঐ বাড়িতে, মনে হয় যেন এই উনিশটি বছর আমাদের জীবনে আসেনি। মনে হয় মা-বাবা-ভাইদের স্বপ্নে দেখি ও কাছে পাই বলেই বুঝি বেঁচে আছি। সারাটা দিন নানা কাজে ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সভা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থেকে কাটিয়ে দেই। কিন্তু রাতে যখন ঘুমুতে যাই তখন চলে যাই অন্য জগতে। সে জগৎ শুধু আমার একান্ত, আমার উনিশ বছর পূর্বের জীবন।

অনেক স্মৃতিভরা ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়ির জীবনে যেন চলে যাই। সেই আগের মতো সবাই আছে। একসঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কখনও রাগ করছি, ভাইবোনে খুনসুটি করছি। কখনও মিছিল আসছে।

www.pathagar.com

কত স্মৃতি। স্মৃতি বড় মধুর! আবার স্মৃতি অনেক বেদনার, যন্ত্রণার! ঘুম ভেঙে বাস্তবজগতে এলেই সেই যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। যত দিন বেঁচে রব এ যন্ত্রণা নিয়েই বাঁচতে হবে।

ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি। আগামী ১৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি মিউজিয়াম হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। কাজ চলছে। মিউজিয়াম করতে গেলে অনেক পরিবর্তন করতে হয়। সে পরিবর্তন কমিটি করাচ্ছে। আমি প্রায়ই যাই দেখতে। দেয়ালগুলিতে যখন পেরেক ঠোকে, জিনিসপত্রগুলি যখন সরিয়ে ফেলে বুকে বড় বাজে, কষ্ট হয় দুঃখ হয়। মনে হয় ঐ পেরেক যেন আমার বুকের মধ্যে ঢুকছে। মাঝে মাঝেই যাচ্ছি, ঘুরে দেখে আসছি যতই কষ্ট হোক। এই কষ্টের মধ্যে ব্যথা-বেদনার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ হল আমরা জনগণকে তাদের প্রিয় নেতার বাড়িটি দান করতে পারছি। জনগণের সম্পত্তি হবে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি। এটাই আমাদের বড় তৃপ্তি। আমরা তো চিরদিন থাকব না কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাড়িটি জনগণের সম্পদ হিসেবে সব স্মৃতির ভার নিয়ে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা। আমরা ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর এই বাড়িটিতে আসি। তারপর থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ সভা এই বাড়িতে হয়েছে। এই ১৯৬১ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত কত ঘটনা এই বাড়ি ঘিরে। মাঝখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৮১ সালের ১১ জুন পর্যন্ত বাড়ি বন্ধ ছিল। আব্বা শাহাদাত বরণ করার পর ওরা বাড়িটি সিল করে দেয়। তারপর আর কেউ প্রবেশ করতে পারেনি।

মনে পড়ে ১৯৬২ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। মণি ভাই এই বাড়ি থেকে নির্দেশ নিয়ে যেতেন, পরামর্শ নিতেন। ১৯৬২ সালে আব্বা গ্রেফতার হন। তখনকার কথা মনে পড়ে খুব। আমি ও কামাল পেছনের শোবার ঘরে থাকি, মাঝখানে বাথরুম, তারপরই মার শোবার ঘর। তখনও বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠি তখন কেবল দুটো শোবার ঘর আর মাঝের বসার ঘরটা হয়েছে। ওর অর্ধেকটায় খোকা কাকা, স্নো ভাই, মণি ভাইসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকত। মাঝখানে পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা বসার ঘর তখনও অসমাপ্ত। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, তার মধ্যে পুলিশ। জানালার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আর একজন অত্যন্ত সতর্কভাবে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি

www.pathagar.com

পর্দার পাশে, ঘর অন্ধকারই তাই আমাকে দেখতে পায়নি। তাড়াতাড়ি কামালের খাটের কাছে গেলাম। ওকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। ও চোখ খুলল, 'হাসুপা কি?'

আমি বললাম, 'পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।' একথা বলেই তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডাকলাম। মা ও আব্বা যখন টের পেয়ে গেছেন। মা বললেন, 'তোমার আব্বাকে ওরা অ্যারেস্ট করবে।' ঐ বাড়ি থেকেই আব্বাকে বন্দি করে নিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ ছয় মাস আব্বা জেলে থাকেন।

১৯৬৪ সালের অক্টোবরে রাসেলের জন্ম। তখনও বাড়ির দোতলা হয়নি, নিচ তলাটা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণে আমার ঘরেই রাসেলের জন্ম হয়। মনে আছে আমাদের সে কি উত্তেজনা! আমি, কামাল, জামাল, রেহানা, খোকা কাকা অপেক্ষা করে আছি। বড় ফুফু, মেজ ফুফু তখন আমাদের বাসায়। আব্বা তখন ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারকাজে। আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করা হয়েছে সর্বদলীয়ভাবে। বাসায় আমাদের একা ফেলে মা হাসপাতাল যেতে রাজি না। তাছাড়া এখনকার মতো এত ক্লিনিকের ব্যবস্থা তখন ছিল না। এসব ক্ষেত্রে ঘরে থাকারই রেওয়াজ ছিল। ডাক্তার-নার্স সব এসেছে। রেহানা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট মানুষটা আর কত জাগবে। জামালের চোখ ঘুমে ঢুলঢুল, তবুও জেগে আছে কষ্ট করে নতুন মানুষের আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। এদিকে ভাই না বোন! ভাইদের চিন্তা আর একটা ভাই হলে তাদের খেলার সাথী বাড়বে, বোন হলে আমাদের লাভ। আমার কথা শুনবে, সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরানো যাবে, চুল বাঁধা যাবে, সাজাব, ফোটো তুলব, অনেক রকম করে ফোটো তুলব। অনেক কল্পনা মাঝে মাঝে তর্ক, সেই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্ত কাটাচ্ছি। এর মধ্যে মেজ ফুফু এসে খবর দিলেন ভাই হয়েছে। সব তর্ক ভুলে গিয়ে আমরা খুশিতে লাফাতে শুরু করলাম। ক্যামেরা নিয়ে ছুটলাম। বড় ফুফু রাসেলকে আমার কোলে তুলে দিলেন। কি নরম তুলতুলে। চুমু খেতে গেলাম, ফুফু বকা দিলেন। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, ঘাড় পর্যন্ত একদম ভিজা। আমি ওড়না দিয়ে ওর চুল মুছতে শুরু করলাম। কামাল, জামাল সবাই ওকে ঘিরে দারুণ হইচই।

দোতলায় উঠার সিঁড়িগুলো তখনও প্লাস্টার হয়নি। মা খুব ধীরে টাকা জমিয়ে এবং হাউজ বিল্ডিংয়ের লোনের টাকা দিয়ে বাড়িটি তৈরি করেন।

www.pathagar.com

অত্যন্ত কষ্ট করেই মাকে এই বাড়িটি করতে হয়েছে। আব্বা মাঝে মাঝে জেলে চলে যেতেন বলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যেত। যে কারণে এ বাড়ি শেষ করতে বহুদিন লেগেছিল। আন্দোলনের সময় বা আব্বা বন্দি থাকা অবস্থায় পার্টির কাজকর্মে বা আন্দোলনে খরচের টাকাও মা যোগাতেন। অনেক সময় বাজার-হাট বন্ধ করে অথবা নিজের গায়ের গহনা বিক্রি করেও মাকে দেখেছি সংগঠনের জন্য অর্থের যোগান দিতে। কাজেই ধীরগতিতেই বাড়ির কাজ চলছিল। দোতলার সিঁড়ি আমার খুবই প্রিয় জায়গা ছিল। হাতে একটা বই নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়তে খুব ভালো লাগত। কেন তা আজও জানি না। আরজু বা শেলী আসলে আমরা সিঁড়িতেই বসতাম, গল্প করতাম। কি যে একটা আনন্দ ছিল! চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ওখানে গিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম। স্কুল ছুটি হলেই বরিশাল থেকে আরজু আসত। আর ছোট ফুফার বদলির চাকরি। আব্বার ভগ্নিপতি বলে আইয়ুব-মোনায়েম সব সময় তার প্রতি এমন দৃষ্টি রাখত ঘন ঘন বদলি করত। কোথাও সাত মাস, কোথাও নয় মাস— যখন যেমন ইচ্ছা। হবিগঞ্জ থেকে রামগড়, ঠাকুরগাঁ থেকে হবিগঞ্জ— এমনি বদলি চলতই। ঢাকা হয়েই যাবার পথ ছিল। রাস্তাঘাট তখন এত ছিল না। প্রায়ই ওরা ঢাকায় আসত, তাছাড়া ছুটিতে তো আসতই। স্কুল ছুটির সময় মেজ ফুফু, খালা সবাই আসতেন। মাটিতে ঢালাও বিছানা। বারান্দায় চুলা পেতে রান্না। আর সব মিলে লুকোচুরি খেলা। দিনরাত খেলার আর শেষ নেই। যেহেতু বাড়ির কাজ শেষ হয়নি। কাজ করছে, কাজেই লুকোবার জায়গাও অনেক ছিল। বাসায় যখন বেশি ভিড় হতো, মিটিং থাকত, আমি ও শেলী ছাদের উপর বসে পড়তাম। অনেক সময় পানির ট্যাঙ্কির উপর বসে পা ঝুলিয়ে গলা ছেড়ে জোরে জোরে পড়তাম। বড় হয়ে গেলেও অনার্স ক্লাসের পড়াও এভাবে পড়েছি।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের পূর্বে ১৯৬৪ সাল ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হল। দাঙ্গায় বহু মানুষকে এ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হল। দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য এবং দাঙ্গা থামাবার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে পরিশ্রম করলেন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনলেন। এটা ছিল সরকারের একটা চাল। সরকারবিরোধী আন্দোলন থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে নেবার এক কৌশল। এখনও ঐ একই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কত ঘটনা যে মনে পড়ে। এই বাড়ি যখন তৈরি

www.pathagar.com

হয়, ইট ভিজানোর জন্য পানির হাউজ তৈরি করা ছিল। চাচি হেলাল, মিনাকে নিয়ে ঢাকায় এলেন। রেহানা, জামাল, হেলাল, মিনা সারাদিন বারান্দায় খেলা করত। আমি বারান্দায় মোড়ায় বসে বই পড়ছি আর হেলাল বারান্দায় রাখা কাঠের দরজা-জানলার পাল্লার স্তূপের উপর বসে খেলছে। একবার নামছে, একবার উঠছে। এর মধ্যে হঠাৎ ও হাততালি দিয়ে উঠল 'মিনা সাঁতার কাটে, মিনা সাঁতার কাটে' বলে— জামাল দেখল মিনা হাউজে পড়ে গেছে। হাউজে নেমে মিনাকে টেনে তুলল। আমি ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতরে এলাম, বেশি পানি খায়নি, তবে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বড় একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল। মিনা আমাদের সবার অত্যন্ত আদরের। আব্বা ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এই খবর শুনলেই আমাদের উপর যে কি যাবে ভাবতেও পারছি না।

১৯৬৬ সালের কথা মনে আছে। কয়েকদিন ধরে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা চলছিল। আমার তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম বর্ষের কয়েকটা বিষয়ের পরীক্ষা হবে, যার নম্বর দ্বিতীয় বর্ষে যোগ হবে। কিন্তু পড়ব কি! মিটিং চলছে বাড়িতে, মন পড়ে থাকে সেখানে। একবার পড়তে বসি আবার ছুটে এসে জানালার পাশে বসে মিটিং শুনি। সবাইকে চা বানিয়ে দেই। যাক সেসব। বিকেলে নারায়ণগঞ্জে বিশাল জনসভা হয় ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য। আব্বার ফিরতে বেশ রাত হল। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে জনসভার গল্প শুনলাম। সেই জনসভায় আব্বাকে ছয় দফার উপর একটা সোনার মেডেল উপহার দেয়া হয়েছিল। রাত বারোটায় আব্বা শুতে বিছানায় গেলেন। আমি পড়তে বসলাম। ঐ বছরই বাড়ির দোতলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই দোতলার পেছনের উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার। দক্ষিণে বড় জানালা। আমি খুব জোরে পড়তাম ঘুম তাড়ানোর জন্য। এর মধ্যে নিচ থেকে মামার চিৎকার শুনি 'পুলিশ এসেছে'। বাড়িতে ঢুকতে চায়। গেটের তালা খুলতে বলে। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে মামা দাঁড়িয়ে। আমি পুলিশ অফিসারকে বললাম, 'আব্বা অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন। এখন রাত দেড়টা বাজে, এখন কি করে ডাকব? তাছাড়া সকালের আগে কি করে বন্দি করবেন? আপনারা অপেক্ষা করুন।' আমি তাদের গেটের বাইরে চেয়ার দিতে বললাম। আর এখন কিছুতেই ডাকতে পারব না বলে জানালাম। আমি বারান্দা থেকে ঘর পেরিয়ে মাঝের বসার ঘরে এসেছি। শুনি

www.pathagar.com

টেলিফোন বাজছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাঝের ঘরের ছোট জানালা খোলা, আব্বা কথা বলছেন টেলিফোনে। ওপার থেকে কি বলছেন শুনছি না, তবে শুনলাম আব্বা বললেন, 'তোমাকে নিতে এসেছে তবে তো আমাকেও নিতে আসবে।' আমি জানালার পাশ থেকে বললাম, 'নিতে আসবে না আব্বা, এসে গেছে অনেক আগে।' আব্বা উঠে দরজা খুললেন। ততক্ষণে বাড়ির সবাই জেগে আছে। রাসেল খুবই ছোট্ট। শুধু ও ঘুমিয়ে আছে। দোতলায় চায়ের ঘরে গিয়ে ইলেক্ট্রিক কেটলিতে চায়ের পানি চাপালাম। চোখের পানি বাঁধ মানে না। মাও চোখের পানি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন আর আব্বার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিলেন, অনেকগুলি এরিনমোর তামাকের কৌটা দিলেন— পরে পাঠাতে অসুবিধা হয় বলে, লেখার জন্য কাগজ, কলম, খাতা সাথে নেন। কিছু বইপত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী, মা সব ঘুছিয়ে দিলেন। আব্বাকে ওরা নিয়ে গেল। ছোট্ট রাসেল অবুঝ, অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিছুই বুঝবে না, জানবে না। সকাল হয়ে গেল। পড়াশোনা আর হল না, মনে হল বাড়িটা বড় শূন্য, ফাঁকা। এতদিনের কর্মচাঞ্চল্য হঠাৎ করে যেন থেমে গেল। সারাটা দিন কারও খাওয়া-দাওয়া হল না। আত্মীয়-স্বজন যারা খবর পেল, দেখা করতে এল, আবার এতদিন যাদের দেখেছি অনেক চেনামুখ আর দেখা গেল না। তবু সুখ-দুঃখের সাথী যারা তারা ঠিকই দেখা করল। একে একে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মীকে ওরা গ্রেফতার করল।

১৯৬১ সালে এই বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কোনোমতে তিনটা কামরা করে এসে আমরা উঠি। এরপর মা একটা একটা কামরা বাড়াতে থাকেন। এভাবে ১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে দোতলা শেষ হয়। আমরা দোতলায় উঠে যাই। ছয় দফা দেবার পর কাজকর্মও বেড়ে যায়। নিচতলাটা তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই ব্যতিব্যস্ত। নিচে আব্বার শোবার কামরাটা লাইব্রেরি করা হয়। ড্রেসিং রুমে সাইকোলোস্টাইল মেশিন পাতা হয়। লাইব্রেরির কামরায় টাইপরাইটার মেশিন। আব্বা আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নেন বন্দিখানা থেকে মুক্তি পাবার পর। তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আওয়ামী লীগের সব নেতা 'এবডো' ছিলেন, অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতিতে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই ছাত্রদের সংগঠিত করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করা হয়। আব্বা অবশ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি বেড়াতে যেতেন বিভিন্ন জেলায়। সেখানে দলকে

www.pathagar.com

সংগঠিত করার কাজ ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রতি জেলা, মহকুমা, থানায় গোপন সেল গঠন করেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দলকে সুসংগঠিত করার কাজ গোপনে চলতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ১৯৬২-তে বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এ বাড়িতে এসেছে গোপনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ নিতে ও আলোচনা করতে। এখন অনেকের অবস্থানই ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মে বলে আমি কারও নাম নিতে চাই না।

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি আব্বাকে ঢাকা জেলখানা থেকে বন্দি করে নিয়ে যায়। ১৮ জানুয়ারি আমরা জেলগেটে গিয়ে আব্বার দেখা পাই না, কোথায় নিয়ে গেছে (বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না।) ছোট্ট রাসেল, অবুঝ রাসেল কিছুই বোঝে না। আব্বা আব্বা করে কেবল কাঁদে। জেল গেট থেকে ফিরে এসে এই বাড়ির মেঝেতে গড়িয়ে আমরা অনেক কেঁদেছি। এরপর শুরু হল মিথ্যা মামলা, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আব্বাকে ফাঁসি দেবার ষড়যন্ত্র। গর্জে উঠল বাংলার মানুষ। শুরু হল আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের চাপে আব্বাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। সেদিন এই বাড়ির সামনে মানুষের ঢল নেমেছিল। সমস্ত বাড়িই যেন জনতার দখলে চলে যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এসে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যেত। আব্বা কখনও গেটের পাশে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে, কখনও বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমরা আব্বার পাশে এসে দাঁড়াতাম, হাজার হাজার মানুষের ঢল নামত তখন এই বাড়ির সামনে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২.৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে পৌঁছল। তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১.৩০ মিনিটে তারা আব্বাকে গ্রেফতার করে

www.pathagar.com

নিয়ে গেল। আজও মনে পড়ে সে স্মৃতি। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৬ মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদারবাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনোমতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাংচুর করে, বাথরুমের বেসিন কমোড আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়— দীর্ঘ নয় মাস ধরে এই বাড়ি লুট হতে থাকে। পাকসেনারা এক গ্রুপ লুট করে যাবার পর আর এক গ্রুপ আসত। সোনাদানা জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা এক কাপড়ে সব বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আর মার যে গহনা লকারে ছিল সেগুলি বেঁচে যায় কিন্তু চাবি হারিয়ে যায়।

ছয় দফা দেবার পর অনেক সোনা-রুপার নৌকা, ৬ দফার প্রতীক প্রায় ২-৩ শত ভরি সোনা ছিল। এগুলি আমার ঘরের স্টিলের আলমিরায় রাখা ছিল। সব লুট করে নিয়ে যায়। যাক, ওসবের জন্য আফসোস নেই, আফসোস হল বই। আব্বার কিছু বইপত্র, বহু পুরোনা বই ছিল। বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলি সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত। জেলখানার বই বেশিরভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন কিন্তু আমার মার অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনও দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলি, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নাড শ'র কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়, তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলিতে ছিল। মা এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলি এনেছেন কিনা। যদিও অনেক বই জেলে পাঠানো হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মার সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বইকেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলি ওরা নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ

www.pathagar.com

বইগুলির জন্য যা ঐতিহাসিক দলিল হয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে সবই হারালাম।

১৯৮১ সালে আমি ফিরে এসে বাড়িটি খুলে দিতে বলি, কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমতি দেয়নি। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতিও পাইনি। মিলাদ পড়ানোর জন্য বাড়ির দরজা জিয়া খুলে দেয়নি। রাস্তার উপর বসেই আমরা মিলাদ পড়ি। জেনালের জিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে থাকার জন্য বাড়ি দেবার প্রস্তাব পাঠান। আমি একজন স্বৈরাচারের হাত থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করি। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবারকে একটি বাড়ি, একটি ফোন, ভাতা, গাড়ি ইত্যাদি কিছু সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে (যেমন— জেঃ এরশাদ সরকারের কাছ থেকে তার স্ত্রী ও পরিবার গ্রহণ করতেন)। আমরা কোনোদিনই কোনো কিছু গ্রহণ করিনি। জেনানেরল জিয়া নিহত হবার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার এই বাড়ির দরজা খুলে দেন। দেশে যখন আবার মার্শাল ল' জারি হয় তখন এই বাড়িটি বিরোধী দলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। যদিও দোতলা বা সিঁড়ি আমরা ব্যবহার করিনি কখনও, কেবল বসার ঘর আর লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করেছি, মিটিং করেছি। অনেক জরুরি পরিস্থিতিতে বহু মিটিং হয়েছে এখানে। ১৯৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে মার্শাল ল'র প্রকাশ্য বিরোধিতা করি। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ বহু ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেছে।

আবার ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর গ্রেফতার করে আমাকে এই বাড়িতে আনা হয়। ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন পর্যন্ত এই বাড়িতে গৃহবন্দি হিসেবে অবস্থান করে আমরা রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের সকল কাজ এই বাড়িতে বসেই করি।

এই বাড়িটি যখন ১২ জুন, ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেওয়া হল তখন বাড়িটির গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ঝুল, ধুলোবালি, পোকামাকড়ে ভরা। ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলি, কাচ ভাঙা, বইগুলি বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভেতরে এখনও বুলেট রয়েছে। একটা বই, নাম 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'। বইটির উপরে কবি

www.pathagar.com

নজরুলের ছবি। বইটির ভেতরে একখানা আলগা ছবি, একজন মুক্তিযোদ্ধার— বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষতবিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের উপর গুলি। ঠিক ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয়, তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। এ বইটির দিকে তাকালে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কেন ওরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে? মনে হল যেন পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল। মায়ের ঘরের আলমারির সব জিনিস বিছানার উপর স্তূপ করা। ঘরের মেঝেতে বড় বড় গুলির আঘাত। দোতলায় মার শোবার ঘর। এই ঘরেই খুকী, রোজী, জামাল, রাসেলকে গুলি করেছে। মা দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, মাকে ওখানে গুলি করেছে। আব্বার বিছানার পাশে টেবিলটায় রক্তের ছোপ এখনও শুকিয়ে আছে। পূর্ব দিকের দেয়াল জুড়ে রক্তের দাগ। ছাদের উপর মাথার ঘিলু গোছা গোছা চুলসহ লেগে আছে। এই ঘরেই হত্যাকারীরা ঐ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারপর দুহাতে ঘর লুটপাট করেছে। দোতলার সিঁড়িতে এখনও রক্তের দাগ রয়েছে। দোতলায় জামালের ঘরের বাথরুমের বড় আয়নাটায় গুলির আঘাতে বড় একটা গর্ত হয়ে আছে। আয়নাটা ভেঙেছে, দোতলার বসার ঘরের পশ্চিম পাশের ঘরটা প্যান্ট্রি ঘরের মতো, ওখানে ইস্ত্রি করার টেবিল। পাশে ডিনার ওয়াগান, কাচের ও রুপার জিনিসপত্র ভরা, উত্তরদিকে একটা সেলফ যেখানে মায়ের হাতের আচারের বৈয়ামগুলি। এখনও সেই আচারের ঘ্রাণ রয়েছে। একটা টিনে কিছু আতপ চাল ছিল, সাত বছর পরও চাল তেমনই আছে। মিটসেপে সব জিনিসপত্র। পাশে একটা আলমারির ভেতরে তোয়ালে ও বিছানার চাদর থাকত, ঠিক সেভাবেই আছে। শুধু ঘরের মধ্যে মাটিতে স্তূপীকৃত কাপড় আর তুলা। তুলা ও কাপড়চোপড়ে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে। এই ঘরে কেন এত রক্তমাখা কাপড়? জানি না সেদিন কি ঘটেছিল? ঐ খুনিরাই বলতে পারে যাদের এতটুকু হাত কাঁপেনি এভাবে গুলি চালাতে। মার বিছানা ও বালিশ গুলিতে ঝাঁঝরা। জামালের ঘরের বিছানা ও বালিশ গুলির আঘাতে আঘাতে ফুটো হয়ে আছে। অনেক দুর্লভ ছবি, জরুরি কাগজপত্র, দলিল, ব্যাংকের চেকবই সব খুনিরা নিয়ে গেছে। ছবিগুলি নষ্ট করেছে, ছিঁড়েছে, পরবর্তী সময়ে পোকায় কেটেছে।

১৯৮৭ সালে জেনালের এরশাদ আমাকে এই বাড়িতে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। সমস্ত বাড়ির জিনিসপত্র ১২ বছরে একদম নষ্ট হয়ে যায়। কারণ

www.pathagar.com

খুনিরা শুধু হত্যাকাণ্ড করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা হত্যার পর লুটপাটও করেছে। এই লুটপাট কয়েকদিন ধরে চলেছে। মা, রেহানা ও জামালের ঘরেই লুটপাটের চিহ্ন। মার ঘরের আলমারির সমস্ত কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিছানার ওপর ছড়ানো। তোষক-বালিশগুলি একদিকে বুলেটে ঝাঁঝরা আবার অনেকগুলি বালিশ ছেঁড়া। দীর্ঘদিনের অযত্নের ফলে মাকড়সার জাল, পোকা ও ধুলায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বা ও মার ঘরের পাশে ড্রেসিংরুমে আলমারিতে যেসব কাপড় ছিল তার সব দলা করে রাখা ও পোকায় খাওয়া। মনে হয় যেন আলমারি খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেছে? কেন? অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র এমনকি শাড়িগুলি পর্যন্ত খুনিরা নিয়ে গেছে। মেঝে ভর্তি পুরু ময়লা, পোকামাকড়, আরশোলা। সমস্ত ঘর ও আলমিরাতে উঁইপোকা। সবকিছুর উপর দিয়ে কি যে ঝড় বয়ে গেছে তা ভাষায় বর্ণনা করে বোঝাবার শক্তি আমার নেই।

এই ঘরবাড়ির সর্বত্র আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া। কিন্তু দস্যু-দানবদের হাতে সব আজ এলোমেলো হয়ে ছড়ানো-ছিটানো। সর্বত্র মনে হয় নারকীয় পিশাচের হিংস্র উল্লাস ও লুণ্ঠনের স্পর্শ। এই বাড়িতেই আমি বন্দি। ধুলায় জমে যতই দিন যাচ্ছে ততই নষ্ট হচ্ছে। বাড়িটাকে একদিন মিউজিয়াম করব, তার আগে পরিষ্কার করা দরকার। মনকে শক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। জিনিসপত্রগুলিতে হাত দেয়া কি যে বেদনাদায়ক তা লিখে বোঝানো যাবে না। শুধু যারা এভাবে সব হারিয়েছেন তারাই হয়তো বুঝতে পারবেন।

আমার মা অত্যন্ত পরিপাটি গোছানো স্বভাবের ছিলেন। প্রতিটি জিনিস অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতেন, যাতে প্রয়োজনে সবকিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়। শীতের কাপড় এক আলমারিতে গোছানো, গরমের কাপড় অন্য আলমারিতে। তেমনি আটপৌরে কাপড়, স্যান্ডেল, জুতা পর্যন্ত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। মা যখন আলমারি খুলতেন দারুণ কৌতূহল হতো সবকিছু দেখার। অনেক সময় আমিও আলমারি খুলতাম, তবে মা যা বের করতে বলতেন তাছাড়া অন্য কিছুতে হাত দিতাম না। তবে মা খুললেই হাত দিতে খুব ইচ্ছা হতো, কিন্তু সব আবার গুছিয়ে রাখতে পারব না বলে হাত দেয়া হতো না। আমার মায়ের হাতের সেই সুন্দর গোছানো সবকিছু আজ দানব-খুনিদের হাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। মনকে মানিয়ে একসময় বালতি ভর্তি পানি, সাবান, কাপড় ঝাড়ু নিয়ে সব ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। এত ময়লা যে একটা ঘর পরিষ্কার করতে দিনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা

www.pathagar.com

কাজ করেও পাঁচ-ছয় দিন লেগেছে। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে আমার মা যেভাবে যে জিনিস যেখানে রাখতেন ঠিক সেখানে রাখতে চেষ্টা করেছি। দুহাতে ময়লা সাফ করেছি আর চোখের পানি ফেলেছি। শুধু মনে হয়েছে এই জন্যই কি বেঁচে ছিলাম। কি দুর্ভাগ্য আমার। সবাই চলে গেল। আমি হতভাগিনী শুধু চোখের জলে ভাসছি আর এই বেদনা-যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কষ্টে দম বন্ধ হয়ে যেত। কাজ বন্ধ রেখে অনেকক্ষণ আকুল হয়ে কেঁদে নিতাম, আবার একসময় মনকে শক্ত করতাম। একটা জিনিসও অক্ষত রেখে যায়নি। যা পেয়েছে লুট করেছে, যা রেখে গেছে ক্ষতবিক্ষত করে রেখে গেছে। ফোটোগুলো ছিঁড়েছে, কাগজপত্র ডায়েরি দলিলপত্র সব নষ্ট করেছে। যে ঘরে যত ধুলা ময়লা ছিল কিছুই ফেলিনি। বড় বড় পলিথিনের ব্যাগে ভরে রেখেছি। কেন যেন ফেলতে পারলাম না। মনে হয় যেন সব ছিল, সবাই ছিল, এইমাত্র বাইরে গেছে, আবার আসবে, আবার আসবে।

সব ঘরই আমি পূর্বের মতো করে সাজাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আম্মা যেটা যেভাবে যেখানে রাখতেন ঐ ভাঙাচোরা সব আবার সেইভাবে রাখতে চেষ্টা করেছি,আমার মায়ের মতো করে। যখনই কোনো জিনিসে হাত দিয়েছি, বিশেষ করে মায়ের আলমিরা খুলে গোছাতে গেছি— মনে হয়েছে, এইমাত্র মা বুঝি পাশে এসে দাঁড়াবেন, বকবেন 'ঘাঁটাঘাঁটি করিস নে, গোছান জিনিস নষ্ট হবে' বলে সাবধান করবেন, পরমুহূর্তে মনে হয়েছে মা তো আমার নেই! সব আছে, এই ঘর, এই বাড়ি— মনে হয় মার নিঃশ্বাস যেন শুনতে পাই, পাশ থেকে তাঁর মমতার স্পর্শ যেন অনুভব করি।

অনেক স্মৃতিভরা ৩২ নং সড়কের এই বাড়িটি। বাড়িটি আমাদের থাকবে না। ওটা এখন জনগণের সম্পত্তি। ট্রাস্ট করে জনগণের জন্য দান করে দিয়েছি। আমার আব্বা শুধু তো আমাদের ছিলেন না; তার থেকেও বেশি ছিলেন— জনগণের। আমরা সন্তান হিসেবে তাঁকে যতটুকু পেয়েছি এদেশের জনগণ তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছে। জনগণের কল্যাণে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জেলে কাটিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। আমরা আর কতটুকু তাঁকে কাছে পেয়েছি! তাই এই বাড়িটি এত স্মৃতিভরা, এ ভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই, রেহানারও নেই। তাই আজ আমরা আনন্দিত এ বাড়িটি জনগণকে দান করে দিতে পেরে।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের দীর্ঘদিনের। আমরা আজ গৌরববোধ করতে পারি আমাদের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি আজ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রিয় তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১০ আগস্ট, ১৯৯৪

www.pathagar.com

ড. আবদুল মতিন চৌধুরী :
আমার স্মৃতিতে ভাস্বর যে নাম

এ জগতে কিছু কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটে কেবল দেশ, জাতি এবং সমাজকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে যাওয়ার প্রয়োজনে। অনাগত কাল জুড়ে এসব কীর্তিমান প্রথিতযশা ব্যক্তি একটি বিশেষ আদর্শ এবং ভাবধারার প্রতীক হিসেবে আমাদের স্মৃতিতে থাকেন, অম্লান প্রোজ্জ্বল এবং ভাস্বর তাঁদের আপন দীপ্তিতে। তাঁরা তাঁদের নশ্বর জীবনকাল জুড়ে মেধা, নিষ্ঠা আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে কালজয়ী যুগোত্তীর্ণতার স্বাক্ষর স্থাপন করেন অনাগত কালের উত্তরপুরুষের জন্য। তারপর হন অতীত, হন ইতিহাস। ড. আবদুল মতিন চৌধুরী ছিলেন ঠিক এমনি একজন মানুষ।

ড. মতিন চৌধুরী শুধু যে একজন সত্যব্রত নিরলস শিক্ষাসেবী মাত্রই ছিলেন একথা সঠিক নয়। আর তাঁকে শুধু এমনভাবে সাদামাটা মূল্যায়ন করাও যায় না। তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির সকল ক্রান্তিকালের অসত্য, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক, বলিষ্ঠ, দৃঢ় এক প্রতিবাদের প্রতীক-পুরুষ। তিনি ছিলেন ন্যায়, সত্য, সুন্দর কর্মের এক অবিচল, অনড় দৃষ্টান্ত। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবোধসম্পন্ন নির্ভীক সমাজ-সচেতন মানুষ। এজন্য বার বার তাঁকে হতে হয়েছে নির্যাতিত, নিগৃহীত। হতে হয়েছে দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার।

ড. আবদুল মতিন চৌধুরীর জীবনে এই নিগ্রহের সূত্রপাত ঘটেছিল সেই পাকিস্তানি শাসনামল থেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন পুনরায় ন্যায়, সত্য, মানবতা এবং জনমতকে লাঞ্ছিত, পদদলিত করার অপপ্রয়াস ঘটে, যখন স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা তার করাল দন্ত বিস্তারে

www.pathagar.com

পুনরায় স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে স্বাধীনতার চেতনা এবং মূল্যবোধকে বিদেশি প্রভুদের ইঙ্গিতে নির্বাসনান্তে স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদী অপশক্তিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, তখন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিদ শিক্ষাসেবীকে কারাবরণ করতে হয়েছিল দুর্নীতির অভিযোগে, পরিণামে যা তাঁর জীবন-মধ্যাহ্নেই সায়াহ্নের সূত্রপাত করেছিল। আর এই কারাবরণই তাঁর শেষ নিগ্রহের ঘটনা হিসেবে সমস্ত জাতির জন্য এক বেদনাঘন অপরিসীম লজ্জা এবং অমোচনীয় কলংকের অভিশপ্ত অধ্যায় হিসেবে বিধৃত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

ড. আবদুল মতিন চৌধুরী তাঁর স্বভাবসুলভ সত্যভাষণ, ন্যায়সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয়তাবোধের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার কারণে পাকিস্তান আমলেই বিরাগভাজন হয়েছিলেন পাক-শাসক আইয়ুব খান এবং তার দোসর গভর্নর মোনায়েম খানের। শাসকগোষ্ঠীর এই তীব্র রোষানলে নিপতিত হওয়ার কারণেই তাঁকে তাঁর প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে পর্যন্ত হয়েছিল। এমন কি তৎকালীন সময়ে আইয়ুব-মোনায়েম চক্র তাঁর দায়িত্ব থেকে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং শিষ্টাচার-বহির্ভূতভাবে অপসারণ পর্যন্ত করেছিল। আমার স্মরণ আছে, সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু তাঁকে ফোন করে বলেছিলেন 'একদিন যখন সময় হবে, তখন অবশ্যই আপনাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনব।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই কথা রেখেছিলেন। ১৯৭৩-এর এপ্রিল মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই প্রথিতযশা পদার্থবিদ এবং দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। অথচ সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা এই যে, যখন আজ আমাকে এই লেখা লিখতে হচ্ছে তখন বঙ্গবন্ধুও নেই, ড. আবদুল মতিন চৌধুরীও নেই। এ দুজনই ছিলেন আমার খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব, আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। একজন আমার পিতা, অন্যজন আমার শিক্ষক, আমার গুরুজন, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী শুভার্থী।

এই মহান মানুষটিকে ঘিরে আমার জীবনের সবচাইতে করুণ, বেদনাঘন, হাহাকারে পরিপূর্ণ একটি বিশেষ স্মৃতি রয়েছে। মানুষের কিছু

www.pathagar.com

কিছু স্মৃতি থাকে যা কখনো অন্তর্হিত হয় না। স্যারকে ঘিরেও রয়েছে আমার ঠিক এমনি একটি স্মৃতি।

ভীষণ ব্যস্ত দিনেও যখন আমি কদাচিৎ একা একা বসে থাকি, ফেলে-আসা-জীবনের স্বপ্নমধুর কিংবা বিষাদ-বেদনার স্মৃতির অর্গল তখনই উন্মুক্ত হয়। আর আমি যেন প্রত্যক্ষ করি, স্যারের সঙ্গে আমার সেই কথোপকথনের দৃশ্য— তখনই প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা অনুভব করি আমার সমস্ত বুক জুড়ে। আমি বেদনায় বিমূঢ় হই।

যখনই আমার সে স্মৃতি মনে হয়, আমার অন্তর কেবল প্রচণ্ড শূন্যতায় আর্তনাদ করে ওঠে। বুকের মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। দলা পাকানো বেদনা কণ্ঠকে রুদ্ধ করে। চোখের দৃষ্টি অজান্তেই ঝাপসা হয়। আমি আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। আর প্রচণ্ডভাবে অনুতপ্ত হতে থাকি নিরন্তর।

কোনো কোনো স্মৃতিচারণ মানুষের পক্ষে খুবই দুঃসহ। আমার বাবা, মা, ভাইদের এবং মতিন স্যারের মতো এমন শুভার্থীর সাথে জড়িত স্মৃতিচারণ করা আমার পক্ষে সত্যিই কষ্টসাধ্য, অসম্ভব। আর এখন আমি সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করার চেষ্টা করছি।

প্রিয় পাঠক, আমি এখন আমার সেই করুণ স্মৃতিচারণ করতে যাচ্ছি, যে স্মৃতির দংশন একমাত্র আমি ছাড়া কাউকে কখনই সহ্য করতে হয়নি। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, আমার মতো কাউকেই যেন এমন ভয়ানক স্মৃতিচারণ করতে না হয় কখনও। সুতরাং এ লেখায় আমার যে দীনতা, যে অপারগতা, যে অক্ষমতা প্রকাশ পাবে— প্রিয় পাঠক, অবস্থা বিবেচনা করে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এই আমার প্রত্যাশা।

দিনটি ছিল ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষের একটি দিন। এতগুলো বছর পরে, এত গভীর শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে এসে সেদিনের তারিখটা আমি আজ আর স্মরণ করতে পারছি না কিছুতেই। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ক্লাসের ছাত্রী। আমার কয়েক মাসের ছুটির প্রয়োজন। কেননা, আমাকে যেতে হবে পশ্চিম জার্মানিতে। সেখানে তখন আমার স্বামীর কর্মস্থল। সুতরাং ছুটির প্রয়োজনে, এবং সবিশেষভাবে দেখা করে আশীর্বাদ চাইবার ইচ্ছায় আমি উপাচার্য ভবনে ড. আবদুল মতিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেদিন আমার সঙ্গে ছিল ছোট বোন রেহানা এবং আমার ছোট ভাই জামালের নব-পরিণীতা স্ত্রী রোজী। আজ

www.pathagar.com

সেই রোজীও নেই, কিন্তু আমার সঙ্গে সমব্যথার অংশীদার হয়ে আজও আমার সেই একটিমাত্র ছোট বোন রেহানা বেঁচে আছে, আমারই মতন প্রচণ্ড শোকের দাবদাহকে বুকের গভীরে ছাই চাপা দিয়ে, যা নিরন্তর কেবল আমাদের অন্তরকে করে চলছে ক্ষত-বিক্ষত।

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আসবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারই আয়োজন চলছে তখন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন জুড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সাজ সাজ রব। বঙ্গবন্ধু আসবেন। তাঁকে বরণ করার জন্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেন উন্মুখ হয়ে আছে।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বঙ্গবন্ধু প্রথম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা-লগ্নে।

তারপর ১৯৪৮-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র থাকাকালীন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুখের উপর প্রথম কার্জন হলের সমাবর্তন সভায় বঙ্গবন্ধু এবং টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাহেব সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'না, উর্দু নয়, বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা' যার জন্য তাঁকে সে সময়ই কারাবরণ করতে হয়েছিল। সরকার থেকে বলা হয়েছিল, 'যদি ভবিষ্যতে শেখ মুজিব রাজনীতি করবে না এই মর্মে মুচলেকা লিখে দেয়, তবেই তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তিনি আইন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।' কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে মুচলেকায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

যখন বাংলার স্থলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার গভীর চক্রান্ত শুরু হয় তখন বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের সংগঠিত করে শুরু করেছিলেন ভাষার জন্য আন্দোলন। পাকিস্তানের জনক অপ্রতিরোধ্য জিন্নাহ সর্বপ্রথম এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়েছিলেন প্রতিরোধের সম্মুখীন। যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুকে সেদিন আজীবন 'রাসটিকেট' করা হয়েছিল এবং ১৯৪৯-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৫২ পর্যন্ত একনাগাড়ে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

১৯৫২-তে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু তখন ভাষার জন্য কারাগারে বসে শুরু করেছিলেন আমরণ অনশন। ফলে ৫২-র মার্চের প্রথম সপ্তাহে অনন্যোপায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মৃতপ্রায়

www.pathagar.com

অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে স্ট্রেচারে করে মুক্তিদানের নামে ফেলে রেখে গিয়েছিল আমার মা এবং দাদা-দাদির কাছে।

সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই আগস্টের ১৫ তারিখে আগমন ঘটবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে, একদিন যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই হয়েছিলেন বহিষ্কৃত। বঙ্গবন্ধুর আগমনে উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী সেই অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করে চলেছেন সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে। ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

আমি দেখা করে বিদেশ যাওয়ার কথা বলায়, তিনি প্রথমে আমাকে নিষেধ করলেন। আমি ড. ওয়াজেদের সেখানে একাকিত্বের কথা বলায় তিনি বললেন, তাহলে যেন অন্তত কয়েকটা দিন আমি অপেক্ষা করে ১৫ তারিখের অনুষ্ঠানটার পরে রওয়ানা করি। এরপর তিনি আমাকে এই ঐতিহাসিক আগতপ্রায় দিনটি যে শিক্ষাঙ্গনসমূহে স্মরণকালের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ দিন এ সম্পর্কে এবং ঐ দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত কর্মসূচির বিষয়ে আলাপ করলেন। পরে আমি ওঠার সময়ে তিনি আবার আমাকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত থেকে যেতে অনুরোধ করলেন।

স্যারের অনুরোধে আমি ভীষণ দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আমি ভাবতেও পারিনি যে তিনি আমাকে থেকে যেতে বলবেন। সুতরাং একটু অপ্রস্তুতই হয়ে পড়লাম। কেননা আজীবন শিক্ষকদের কথা মান্য করার শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। অথচ আর একটা দিন পরেই আমার ফ্লাইট। স্যারকে বললাম, আমি আর একবার বিষয়টা ভেবে দেখছি এবং থেকে যেতে চেষ্টা করব।

দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই বাসায় ফিরলাম এবং ফিরে এসেই মাকে স্যারের অনুরোধের কথাটা বললাম। কয়েকদিন আগে থেকেই আমার ছেলে জয়ের খুব জ্বর এসেছিল। সুতরাং থেকে যেতেই মনস্থ করে ফেললাম। কিন্তু সন্ধ্যায় ড. ওয়াজেদের ফোন এলো জার্মানি থেকে। আমি ওয়াজেদকে স্যারের নিষেধ এবং ১৫ তারিখে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে আমার ইচ্ছের কথা জানালাম। আরও বললাম, একদিকে জয়ের জ্বর, অন্যদিকে ১৫ তারিখের অনুষ্ঠান— আমি খুব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। উত্তরে আমার স্বামী জানালেন যে তিনি ইতোমধ্যেই ছুটি নিয়ে ফেলেছেন এবং বাজারও করে ফেলেছেন। অগত্যা আমি যাওয়াই স্থির করলাম। ৩০ জুলাই আমি ঢাকা ছাড়লাম, আর ৩১ জুলাই আমি জার্মানি পৌঁছুলাম। আমার আর স্যারের অনুরোধ রাখা হলো না।

www.pathagar.com

এর মাত্র পনেরোটা দিনের মধ্যে যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল, আমি তার জন্য কখনোই প্রস্তুত ছিলাম না। এত বড় রোজকিয়ামত আমি কোনো দুঃস্বপ্নেও দেখেনি। এ আমি ভাবিনি।

১৫ তারিখে আমার বাবা, মা, তিন ভাই, চাচা, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে আমি হারালাম। ঐ দিনটি আমার জন্য যেমন ছিল, এমন দিন যেন কারো জীবনে কখনোই না আসে। আমার ছোট বোন রেহানা তখন আমার সঙ্গেই জার্মানিতে ছিল।

মাঝে মাঝে মনে হয়, সেদিন যদি স্যারের কথা অমান্য না করে ঢাকায় থেকে যেতাম, আমার জন্য সেটাই ভালো হতো। বেঁচে থাকা এই জীবনটাতে যে কি যন্ত্রণা, তা লিখে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। প্রিয় পাঠক, সে আমি বোঝাতে পারছি না। সব হারিয়ে এমন বেঁচে থাকতে তো আমি চাইনি। এই যে প্রতিদিন পলে পলে দগ্ধ হওয়া, এই যে সকল হারানোর প্রচণ্ড দাবদাহ সমস্ত অন্তর জুড়ে, এই যে তুষের আগুনের ধিকিধিকি জ্বলুনির জীবন, এ জীবন তো আমি চাইনি। এর চেয়ে মা, বাবা, ভাইদের সঙ্গে যদি আমিও চলে যেতে পারতাম, তবে প্রতিদিনের এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে তো বেঁচে যেতাম। আমার জন্য সেটাই ভালো হতো। আমি কেন যে তখন স্যারের নিষেধ শুনলাম না। সেই গ্লানি, সেই অন্তর্দাহ আজও আমাকে কুরে কুরে খায়। আমি নিয়তই সেই কেন'র জবাব খুঁজে ফিরি। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়। দলা-পাকানো বেদনায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। স্মৃতির নিদারুণ কষাঘাতে আমি জর্জরিত হই।

১৫ আগস্ট বাংলার মাটিতে ইতিহাসের জঘন্যতম কালো অধ্যায় রচিত হওয়ার পর ড. আবদুল মতিন চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন মহৎ-হৃদয় সত্যসেবী শিক্ষাবিদ ড. আবদুল মতিন চৌধুরী জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আরোহণের পর। ক্ষমতায় এসেই অত্যাচারের স্টিমরোলার চালায় জিয়া।

দীর্ঘদিন জেল খাটার পর ১৯৭৮-এ ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি মুক্তি পান। তারপর থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কি কঠোর পরিশ্রমই না করেছেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে। সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের হুমকির, হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। তারপরও অকুতোভয় সৈনিক তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন মৃত্যুর পূর্বক্ষণটি পর্যন্ত।

www.pathagar.com

১৯৮১-র মে মাসে আমি যখন দেশে ফিরে আসি, তাঁর কাছ থেকে আমি তখন যে সহযোগিতা, যে আন্তরিকতা পেয়েছি, তা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। তিনি আমাকে পিতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

১৯৮১ সালের ৭ জুন 'ছয়-দফা দিবস' উপলক্ষে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হোটেল ইডেনে। সেই সভায় বক্তৃতা করার পর তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরের দিন খুব সকালে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। একসঙ্গে চা পান এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ সম্বলিত একটি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। সে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি প্রথম প্যারার 'ডিকটেশন'ও দিয়েছিলেন তিনি।

২৩ জুন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে মাজহারুল ইসলাম সাহেবের বাসায় আমাকে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। ২৪ জুন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

আমার দুর্ভাগ্য, সব হারিয়ে আমি বাংলাদেশে ফিরেছিলাম। লক্ষ মানুষের স্নেহ-আশীর্বাদে আমি সিক্ত হই প্রতিনিয়ত। কিন্তু যাঁদের রেখে গিয়েছিলাম দেশ ছাড়ার সময়, আমার সেই অতি পরিচিত মুখগুলি আর দেখতে পাই না। হারানোর এক অসহ্য বেদনার ভার নিয়ে আমাকে দেশে ফিরতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু আমাকে আরও একবার প্রচণ্ড অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল। মাঝে মাঝে নিজকে বড্ড অসহায় মনে হয়।...

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। বাংলার মানুষ তাঁর অবদান কোনোদিনই ভুলবে না।

জানুয়ারি, ১৯৯২

www.pathagar.com

বেগম জাহানারা ইমাম

বেগম জাহানারা ইমাম আর আমাদের মাঝে নেই। গত ২৫ জুন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু যাবার আগে মানুষের চেতনায় এক অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে কী এক যাদুমন্ত্রে সুপ্ত মানুষকে জাগ্রত করে গেছেন। যার বড় প্রয়োজন ছিল এই দেশ ও জাতির জন্য।

আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, 'তুমি আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছ। আমি ঘরে বসে লেখালেখির কাজ করতাম। এর মধ্য দিয়েই যা বলার বলে যেতাম। কিন্তু যেদিন তুমি আমার বাড়ি গেলে, কথা বললে কী যেন হয়ে গেল আমার মধ্যে। আমি নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করলাম। বোধ হয় এই আন্দোলনই আমাকে টেনেছিল তখন।'

তার 'একাত্তরের দিনগুলি' বইটি যখন আমি পড়তাম এক একটি ঘটনা আমার কাছে ছবির মতো মনে হতো। ঐ সময় ঢাকায় আমি, মা, রাসেল, রেহানা, জামালসহ পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার-নির্যাতন আমরা দেখেছি ও শুনেছি। বন্দি অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের আওয়াজ না পেতাম মনে হতো যেন মরে আছি। মুক্তিযোদ্ধাদের বোমা ফাটার বা অস্ত্রের আওয়াজ ছিল আমাদের কাছে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, বন্দিজীবনের আশা-ভরসার সাথী। ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ১৮ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে আমরা বন্দি ছিলাম। ঐ রোডেও অনেক সময় মুক্তিবাহিনী অপারেশন চালায়। যদিও ওদের অপারেশনের পর আমাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই যেত। রাতে বাতি বন্ধ করে দিত। বাজার-হাট রান্না প্রায় বন্ধ থাকত। খাওয়া-দাওয়া করতে দিত না। খেতে বসলেই জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে অস্ত্র তাক করে বলতো, 'খাওয়া শেষ। বাতি বন্ধ করে দেন, আর খাওয়া লাগবে না।'

www.pathagar.com

এমনি নানা ধরনের অত্যাচারের বর্ণনা এ লেখার ক্ষুদ্র পরিসরে দিতে চাই না।

ঐ বই পড়তেই মন থেকে দারুণ একটা তাগাদা অনুভব করলাম যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তাঁর কথা সবসময় শুনতাম অনেকের কাছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার নিয়ে উনি বিদেশে চিকিৎসা করে দেশে ফিরছেন। একদিন তাঁর কাছে গেলাম। প্রথম দেখা হতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কেন জানি না আমার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। তিনি এক সন্তানহারা মা আর আমি এক মা-বাবা-ভাই হারা, ব্যথিত হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারি না। কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। শুধু চোখের পানির মধ্য দিয়েই না বলা অনেক কথা যেন বলা হয়ে গেল। উনি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে বসালেন। অনেকক্ষণ দুজন দুজনকে ধরে কাঁদলাম। উনি আমাকে বললেন, 'তোমার মনকে অনেক শক্ত করতে হবে। অনেক কঠিন দায়িত্ব তোমার ওপর।' আমি তাঁর দোয়া চাইলাম। সমব্যথার ব্যথী একসাথে হয়েছিলাম। স্বজন হারাবার ব্যথায় ব্যথিত আমি বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, যিনি সন্তানহারানোর বেদনায় জর্জরিত। এরপর একদিন আমার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যাই একজন মুক্তিযোদ্ধার মা'কে দেখাবার জন্য। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদমিনারে ফুল দিয়ে ফুলার রোড আইল্যান্ডের ওপর সমন্বয় কমিটির সভায় গিয়ে বক্তব্য রাখি। উনি তখন বিশ্রামের জন্য পাশের এক কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন। এরপর ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে প্রথম জনসভা হল। উনি আমাকে সেই সভায় বক্তব্য রাখতে আহ্বান করলেন এবং জনসমাগম যাতে ভালো হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি তার কথামতো সব ব্যবস্থা করলাম, নিজেও উপস্থিত হলাম। তারপর গণ-আদালত, ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটির আন্দোলন চলাকালে তিনি যখনই আমার কাছে যেকোনো সহযোগিতার জন্য ছুটে এসেছেন, তাঁর মধ্যে একটা দৃঢ়তা দেখেছি। তিনি সবসময় বলতেন, 'আমি তোমার সাহায্য ছাড়া এগোতে পারব না। যে যত কথা বলুক, আমি জানি তুমি এ আন্দোলনে আমার সঙ্গে আছ।'

গণ-আদালত বসার আগের দিন পর্যন্ত তাঁকে ভীষণভাবে অপদস্থ করা হয়, যার ফলে তিনি বাড়িতে থাকতে স্বস্তিবোধ করেননি। এমনকি গণ-আদালত যাতে না বসতে পারে তার জন্য তার ওপর নানা মহল থেকে চাপ

www.pathagar.com

সৃষ্টি হতে থাকে। তারপরও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সাহসী। এ শিক্ষা অবশ্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯৩ সালের ২৫ মার্চ পুলিশের সাদা জিপের তাড়া খেয়েও তিনি আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন। আমার হাত ধরে বলেছিলেন, 'আমার কালকে সভা আছে।' আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলাম জনগণ আপনার সভায় থাকবে। পরদিন সরকার কিভাবে অঘোষিত কারফিউ জারি করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-প্রেসক্লাব-জিপিও-বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সকলের নিশ্চয় মনে আছে। এসব স্মৃতি আমাকে এখনও উজ্জীবিত করে রাখে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে বাংলাদেশ থেকে জার্মানি গিয়েছিলাম। মা, বাবা, ভাই সবাইকে রেখে গিয়েছিলাম। আমার সেই বাংলাদেশ, যেখানে গোলাম আজম ছিল না, যেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীনতাবিরোধীরা রাস্তায় নামতে পারত না, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারত না, দল করবার অনুমতি ছিল না, সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু ১৯৮১ সালে যেদিন দেশে ফিরলাম, মনে হল যেন আরেক বাংলাদেশ, যেখানে আমার আপনজন কেউ বেঁচে নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিয়েছে আমার মা, বাবা, ভাইদের। ছোট্ট রাসেল, বয়স মাত্র ১০ বছর ছিল, তাকেও রেহাই দেয়নি। আমার মা, জানি না কি অপরাধ ছিল তাঁর। কামাল ও জামাল এবং তাদের নবপরিণীতা বধূ, যাদের হাতের মেহেদির রং তখনও মুছে যায়নি, ঘাতকরা তাদেরও রেহাই দেয়নি। আমার চাচা শেখ আবু নাসের, যার একটি পা পঙ্গু ছিল, ঐ পঙ্গু পা নিয়ে যিনি দিনের পর দিন মুক্তিযুদ্ধে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন, ঘাতকরা তাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। মণি ভাই, যিনি ১৯৬০ সাল থেকে ছাত্রদের সংগঠিত করে ছাত্র রাজনীতি করে স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী আরজু— যে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল, তাকেও হত্যা করেছে। সেরনিয়াবাত ফুফা যিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ-চরিত্রের অধিকারী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে বেবী, ১০ বছরের ছেলে আরিফ, ৪ বছরের নাতি সুকান্তসহ ভাতিজা শহীদ, বাড়ির কাজের ছেলে এবং আশ্রিত গ্রামের নাম-না-জানা লোকজনকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। কর্নেল জামিল, যিনি আমার বাবাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁকেও সামরিক

www.pathagar.com

বাহিনীর আইনকানুন লঙ্ঘন করে হত্যা করেছে। এখানেই ঐ ঘাতকরা ক্ষান্ত হয়নি, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আমাদের জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, কামারুজ্জামানকে কারাগারে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

স্বজন হারাবার শোক নিয়ে, বেদনায় ভরা মন নিয়ে দেশের মাটিতে ছয় বছর পর ফিরলাম। দেখলাম শুধু আমার আপনজনদেরই হারাইনি, হারিয়েছি আমার স্বাধীনতা— প্রিয় স্বাধীনতাকে, যাকে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করেছিল, লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়েছিল। বাঙালির স্বাধীনসত্তাকে বিশ্বমাঝে প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিই আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে রয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার, নাম জেনারেল জিয়াউর রহমান। অবৈধভাবে জেনারেল জিয়া অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে নিজেই রাষ্ট্রপতি করে। তারপর নিজের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে যারা অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ, লুঠপাট ও গণহত্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছে তাদের জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেয়। অথচ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দালাল আইন প্রণীত হয়েছিল। জেনারেল জিয়া তার অবৈধ ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার জন্যই সেদিন এসব ঘৃণ্য দালালকে জেলমুক্ত করে এবং ঘাতক-দালালবিরোধী যে সমস্ত আইন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধু করেছিলেন, সব মার্শাল ল' অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। পরে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজন করে।

যেমন, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ দালাল আইন P.O. No. VIII মত ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন জারি করা হয় ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।

১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গোলাম আজম গংদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। এবং সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ রাখা হয়।

৬৬ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দালালদের ভোটাধিকার ও সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণ বাতিল করা হয়।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর ক্ষমতার চাবি জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে চলে গেলে—

www.pathagar.com

* Ordinance No 63 মত ১৯৭৫ এর মাধ্যমে দালাল আইন বাতিল করা হয় ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

* Second Proclamation Order No-3 মত ১৯৭৫ এর প্রথম তফসিল থেকে বাংলাদেশ দালাল আইনের যে সেফগার্ড ছিল তা তুলে দেওয়া হয় ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

* Second Proclamation Order No-3 মত ১৯৭৫ জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করবার সুযোগ করে দেবার জন্য সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাবলি তুলে দেওয়া হয় ১৯৭৬ সালে।

* Second Proclamation-এর ঘোষণা জারির মাধ্যমে সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে দালালদের ভোটার হবার সুযোগ করে দেয়।

* Proclamation Order No-1 মত ১৯৭৭ জারি করে ঘাতক-দালালদের সংসদে নির্বাচন করবার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

* Proclamation Order No-1 মত ১৯৭৭ জারি করে ঘাতক-দালালদের নির্বাচন করার ও সংসদে বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হয়।

* Proclamation Order No-1 মত ১৯৭৭ দ্বারা সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হয়।

১৯৭৬ সালে ১৮ জানুয়ারি নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে বলা হয়। যে সূত্র ধরে স্বাধীনতা-বিরোধীরা বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ পায়।

১৯৭৬ সালের জুন মাসে আরও একটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭২ সালে জারিকৃত 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস আদেশ' বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্বাধীনতাবিরোধী চিহ্নিত কারাবন্দি শাস্তিপ্রাপ্তদের জেনারেল জিয়া মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বানান। শহীদ পরিবারদের জন্য যে সমস্ত ঘরবাড়ি বঙ্গবন্ধু বরাদ্দ করেছিলেন তাও কেড়ে নেয়া হয়। জেনারেল জিয়াই এই প্রক্রিয়া শুরু করে। তার Divide and Rule নামক কৌশল দেশের রাজনীতিতে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধে ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে গদিতে বসেই। গোলাম আজমকে দেশে ফিরিয়ে আনে। সংগঠন করবার সুযোগ করে দেয়। একথা আমার মনে আজ বার বার জাগে, যখন জিয়া গোলাম আজমকে দেশে ফিরিয়ে আনে তখন তীব্রভাবে গোলাম আজমের বিচারের

www.pathagar.com

দাবি ওঠা উচিত ছিল এবং তখনই গণ-আদালত বসালে আজ আর নাগরিকত্ব পেত না। শিক্ষাঙ্গনে শিবিরের রাজনীতি বিস্তার লাভ করত না।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে এই সমস্ত অর্ডিন্যান্স সংবিধানে সংযোজন করা হয়। গত ১৫ বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে, আদর্শ-উদ্দেশ্যকে সঙ্গীনের খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছে। তার ওপর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে পরিবেশন করেছে। স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক থেকে শুরু করে সর্বস্তরে এই প্রক্রিয়া চলছে, ফলে আমাদের দেশের যুবক কিশোর শিশুরা আজ আর প্রকৃত ইতিহাস জানে না। এই স্বাধীনতাবিরোধীদের মনগড়া ইতিহাস সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ধারাবাহিকতা গত উনিশ বৎসর চলে আসছে। দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। শুধু ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতনের পর ৪ ডিসেম্বর রাত থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত টেলিভিশনে ও রেডিওতে শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের গান। তারপর মনে হয় যেন অদৃশ্য কোনো নির্বাচনে আবার সব বদলে গেল। নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে গোলাম আজমের সঙ্গে বৈঠক করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিট ভাগাভাগি করল, যত সিট পাবার কথা নয় তা পেল, সঙ্গে সঙ্গে জামাতকেও নির্বাচিত হবার সুযোগ করে দিল। এত করেও পর্যাপ্ত সিট পেল না সরকার গঠন করবার মতো, পরে আবার গোলাম আজম-খালেদা বৈঠক হল, মহিলা আসনের সিট ভাগাভাগি করে জামাতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করল।

১৯৯১ সালে সংসদে জামাতের সঙ্গে সকলেই বসেছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বসা, আলোচনা করা, রিপোর্ট সই করা— সবই চলছে— এমন কি দ্বাদশ সংশোধনীতে জামাতও ভোট দিয়েছে এবং একই সঙ্গে সই করেছে।

বিএনপি অর্থাৎ জেনারেল জিয়াউর রহমান ও তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গোলাম আজমকে দেশে আসা ও নির্বাচনী সিট ভাগাভাগির ওয়াদা হিসেবে নাগরিকত্ব প্রদান— সবই পরিকল্পিতভাবে করেছে। অপর দিকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যিনি গোলাম আজমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন, এই অসুস্থ শরীর নিয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়া তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর মামলা দিয়েছে।

www.pathagar.com

এই আন্দোলনটা যদি ১৯৭৭ সালেই শুরু করা হতো তাহলে তো গোলাম আজম ফিরে যেতে বাধ্য হতো, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা যেত। জামাতে ইসলামী পার্টি হিসেবে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু কেন? কেন শুরু হয়নি? আমি তখন দেশে ফিরতে পারিনি। আমাদের জন্য দেশে ফেরা তখন নিষিদ্ধ ছিল। তাই তখনকার কথা পুরোপুরি জানি না, তবে যারা আজ আন্দোলন করছেন তারা তো সেদিনও ছিলেন। জিয়াউর রহমানের সঙ্গেও অনেকে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাকে বাধা দেওয়া হয়নি কেন যে, এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে আর কিছু থাকবে না।

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ও গোলাম আজম বৈঠক এবং নির্বাচনে সিট ভাগাভাগির যে পর্যায়ে, তখনই বা কেন প্রতিবাদের ঝড় উঠল না? তখন যদি তাকে বিরত করা হতো তাহলে তো আর জামাত এত সিট নিয়ে পার্লামেন্টে বসতে পারত না। আমাদেরও তখন জামাতের সাথে পার্লামেন্টে বসতে হতো না। একাদশ দ্বাদশ সংশোধনীতে ভোট দিতে হতো না। সংসদীয় কমিটিতে বসতে হতো না, সই করার প্রয়োজন হতো না।

সরকার গঠনের জন্য যখন বৈঠক হল, তখনও যদি চেতনার উন্মেষ ঘটত তাহলে আজ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না। সংসদে বিএনপি সরকারের সাথে বিরোধীদলের যে চার দফা চুক্তি হল তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এ সম্পর্কে আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যতবার দাবি তুলি, কই সকলে তো সেভাবে সোচ্চার হচ্ছে না।

আজ শহীদ জননী মৃত্যুবরণ করলেন দেশদ্রোহীর মামলা মাথায় নিয়ে। যাঁর ছেলে স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে, যিনি স্বামী হারিয়েছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করেছেন, তিনি হলেন দেশদ্রোহী। আর তারই পাশাপাশি যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়, সে পেলো নাগরিকত্ব। এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখব! এ অপমান ও গ্লানি কি করে ভুলব! শহীদ জননী একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার চেয়েছেন সেই অপরাধে বিএনপি নেত্রী তার নিজের বা দলের পক্ষ থেকে এতটুকু সম্মানও শহীদ জননীর প্রতি দেখালেন না। এত বড় অবজ্ঞা কেন করা হল? মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররা তাকে অভিবাদন জানান। মন্ত্রী মীর শওকত বলেছিলেন তার 'ম্যাডাম' অনুমতি দিলে তিনি যাবেন। কিন্তু তার ম্যাডাম তাকে সে অনুমতি দেননি, তাই তিনিও আসেননি। আসেননি তাতে জাহানারা ইমামের কোনো সম্মানহানি হয়নি। তাকে বাঙালি জাতি সম্মান দিয়েছে শহীদ জননী হিসেবে।

www.pathagar.com

মুক্তিকামী মানুষ তাকে সম্মান দিয়েছে হৃদয়ের গভীর উষ্ণতায়।

জাহানারা ইমাম যে চেতনা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, আজকের প্রজন্ম এতদিন যাদের মিথ্যা স্তবকে ভুলেছিল— আজ তারা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাসকে খুঁজে বের করবে। নিজেদের আত্মপরিচয়কে চিনে নেবে— এ চেতনা তিনি জাগ্রত করে গেছেন।

শহীদ জননী তুমি ঘুমাও শান্তিতে— আমরা জেগে রব তোমার চেতনার পতাকা তুলে ধরে।

www.pathagar.com

নূর হোসেন

১০ নভেম্বর ১৯৮৭, ঢাকা অবরোধ দিবস। এক দফা অর্থাৎ জেনারেল এরশাদের স্বৈরসরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করানোর লক্ষ্যে অবরোধ আন্দোলনের ডাক দেই। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার গ্রামে-গঞ্জেও 'চলো চলো, ঢাকা চলো' রব উঠল। ভীত সরকার সরাসরি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হবে আঁচ করে কাপুরুষের মতো ঢাকার প্রতিটি প্রবেশ-দ্বারে, রাস্তার মুখে পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করল— যাতে কেউ ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধে সাধ্য কার? সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর, পেশাজীবী মানুষ, ছাত্র-রাজনৈতিক কর্মী যে যেভাবে পারছে ঢাকায় আসতে শুরু করেছে।

১৯৮৬ সালে নির্বাচনে এদেশের মানুষ তাদের রায় জানিয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও পনেরো দলীয় জোটকে ভোট দিয়ে এই সরকারের পতন অনিবার্য করেছিল। কিন্তু অস্ত্র হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে সেনাছাউনিতে বসে ক্ষমতায় আরোহণকারী-চক্র। লুঠতরাজ করা ও আখের গোছাবার স্পৃহা তাদের অন্যায় পথে ক্ষমতা পরিবর্তনের ধারা অবলম্বনের দিকে তাড়িত করে। সেনাছাউনিতে বসে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা ধরে ফলাফল পরিবর্তন করে পুনঃপ্রচার করে এবং নিজেদের জয়ী হিসেবে ঘোষণা দেয়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হবার যে সম্ভাবনা ছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের মন্তব্য লক্ষণীয়। তারা এসেছিল নির্বাচন দেখতে। তারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেছেন— From what we saw the principle offenders in rigging the elections were the jatya Party. They were responsible

www.pathagar.com

for turning what could and should have been an historic return to democricary in Bangladesh into a tragedy for 'democracy'.

Lord Ennals. Mr. Martin Brandon-Braveo. M.P. and Mr. David Lay (B.B.C.) 8 May 1989

গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে যে ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত করা হল তার জন্য সরকারি দল জাতীয় পার্টির ব্যাপক কারচুপিই যে দায়ী তা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যরা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

ভোট ডাকাতি ও 'মিডিয়া ক্যু' অর্থাৎ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ফলাফল পরিবর্তনের পরও ব্যাপক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যতটুকু ফলাফল আমরা বাঁচাতে পেরেছিলাম তা নিয়ে পার্লামেন্টে বসি। সেখানে গণবিরোধী বাজেট সংশোধনে সরকারকে বাধ্য করি যা অতীতে কখনও হয়নি। জাতীয় তদন্ত ও সমন্বয় বিল নামে অপর একটি গণবিরোধী বিলও পাশ করতে দেয়া হয়নি। এরপরই আনা হলো জনতার অধিকারহরণ ও প্রশাসনকে সামরিকীকরণের জেলা পরিষদ বিল। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখেও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিল মাত্র চার মিনিটেরও কম সময়ে পাশ বলে ঘোষণা দেয়া হল। পার্লামেন্টের সকল রীতিনীতি ভঙ্গ করা হল।

সরকারি আচরণের একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে আমরা পার্লামেন্টে থাকতে তাদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের মুখোশও ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিল। তাতে এই পার্লামেন্টে তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। আমরা এই বিলের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করি এবং আন্দোলনের ডাক দেই।

সে সময় অবশ্য আমাদের জোট ছাড়া অন্য কোনো দল আন্দোলনে নামেনি। আন্দোলন সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। সাফল্য যখন নিশ্চিত তখন অনেকেই আন্দোলনে শরিক হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দেয়।

এরশাদ সরকার কামাল-মুন্নাসহ আরও কয়েকটি তাজা প্রাণ কেড়ে নেয়। বিল রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদন করতে পাঠান হলেও জনতার প্রতিরোধের মুখে এরশাদ সাহেব অনুমোদ না করেই বিল ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। জনতার জয় সূচিত হয়।

এই উপমহাদেশের বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাসে সংসদ থেকে পাশ করা বিল ফেরত পাঠাতে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করা কেবল বাংলার জনগণই করতে পেরেছে। সংসদের ভেতরে ও রাজপথে আমরা আন্দোলন

www.pathagar.com

চালাতে থাকি, কারণ এই সরকারকে অপসারণ করতে না পারলে জনগণের মুক্তি আসতে পারে না।

নির্বাচনের পর পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে এরশাদ সামরিক আইন তুলে নিয়েছিলেন এবং দাবি করে যাচ্ছিলেন যে তিনি গণতন্ত্র দিয়েছিলেন কিন্তু এ তন্ত্রকে আর যাই হোক গণতন্ত্র বলা যায় না। আইয়ুব, জিয়া, এরশাদ প্রতিটি সামরিক স্বৈরাচার তাদের নিজেদের মডেলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে, বলছে। মূলত দেশের মানুষের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার ও মৌলিক অধিকার ক্যান্টনমেন্টেই বন্দি। সেখানেই ক্ষমতার উৎস; জনগণ ক্ষমতার উৎস নয়। ক্ষমতার বদল হচ্ছে বুলেট দিয়ে, ব্যালট দিয়ে নয়। এই 'তন্ত্র'কে রিমোট কন্ট্রোল 'মার্শাল ডেমোক্রেসি' (সামরিক গণতন্ত্র) বলা চলে। জনতার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এক দফা কর্মসূচি নিয়ে আমরা ঢাকায় অবরোধের ডাক দেই। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ ঢাকায় আসার প্রস্তুতি নেয়, সব দমননীতি উপেক্ষা করে। ৮ নভেম্বর থেকেই সরকার ঢাকার সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জনপথ, সড়কপথ বন্ধ করে দেয় যাতে মানুষ ঢাকায় আসতে না পারে। সমস্ত জেলা থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; তারপরও ঢাকার রাজপথে জনতার ঢল নামে। ১৪৪ ধারাও উপেক্ষা করে মানুষ রাজপথে নামে।

স্বৈরাচারের ভিত কেঁপে ওঠে। কেবল ক্যান্টনমেন্টই সরকারের ক্ষমতার উৎস হিসেবে রয়ে যায়। সেখান থেকেই দেশ ও জাতিকে শাসন ও শোষণ করে চলে তারা। একদিন এ অবস্থার অবসান ঘটবেই। আমরা চাই রাজনীতি অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অস্ত্র দিয়ে রাজনীতি সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যায়, তবে তা চিরস্থায়ী হয় না।

আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়াউর রহমান চেষ্টা করেছিল পারেনি, এরশাদও পারবে না। জনতার জোয়ারে তখত তাউস ভেঙ্গে খান খান হবে।

কথা ছিল ১০ নভেম্বর সকাল ১০টায় অবরোধ শুরু হবে। সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র অচল করে দিয়ে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে। প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে সচিবালয়ের পাশে তোপখানা রোডে এলাম। মুহূর্তে দু'পাশ থেকে জনতার ঢল নামল, যেন এজন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সবাই। মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। পনেরো দলীয় ও আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ দলীয় নেতারা গাড়ির ভেতরে। চারদিকে হাজার হাজার মানুষ। গাড়ির পাশে পাশে আমাদের দলীয় কর্মীরা।

সামনে স্লোগান দিতে দিতে এক তরুণ এগিয়ে যাচ্ছে। লম্বা কদম, দোহারা শরীর, মাথাভরা চুল, কোমল কপোল ছাপিয়ে দুটি শান্ত চোখ এবং বাংলার শ্যামল মাঠের মতো গায়ের রং। রক্তজবার মতো লাল রঙের শার্টটি কোমরে বাঁধা। বুকে-পিঠে সাদা রঙের কালিতে লেখা দুটি স্লোগান—বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক', পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। আমি দারুণভাবে চমকে উঠলাম। ধীর পদক্ষেপে স্লোগান দিতে দিতে এক সময় থেমে আমাকে লেখাগুলি দেখাল সে। শিল্পীর তুলিতে আঁকা লেখা। গাড়ি তখন মুক্তাঙ্গন ছাড়িয়ে জিরো পয়েন্টের দিকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছে। আমি ইশারায় তাকে কাছে ডাকলাম। সে বুঝতে পারল না। গাড়ির জানালা দিয়ে কর্মীদের অনুরোধ করলাম তাকে কাছে নিয়ে আসতে। জনতার স্রোতে মাঝে মাঝেই সে আমার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছিল। আর তখনই কি এক অজানা আশংকায় আমার মন কেঁপে উঠছিল।

কে একজন গিয়ে তাকে কাছে নিয়ে এল, জানাল ওর নাম নূর হোসেন। মনে পড়ে আমি তাকে বলেছিলাম—'জামাটা গায়ে দাও, একি সর্বনাশ করেছো, ওরা যে তোমাকে গুলি করে মারবে।'

নূর হোসেন মাথাটা এগিয়ে দিল আমার কাছে। বলল—'জান দিয়া দিমু আপা, আপনে শুধু মাথায় হাত বুলাইয়া দ্যান।'

আমি ভীষণভাবে তার কথার প্রতিবাদ করলাম—'না, জীবন দেবে ক্যানো, আমি আর শহীদ চাই না, আমি গাজী চাই।' ওকথা আর মুখেও আনবে না। জামাটা গায়ে দাও।' ওরা তোমাকে গুলি করবে বলে নূর হোসেনের মাথাভরা ঝাঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। চুলগুলি মুঠো করে ধরে আবার বোনের দাবি নিয়ে অনুরোধ করলাম জামাটা পরতে। আমার হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ নূর হোসেন গাড়ির পাশে পাশে হাঁটল। তারপর কখন যেন জনতার স্রোতে হারিয়ে গেল।

জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করে গাড়ি এগোতে যাবে, হঠাৎ সেক্রেটারিয়েটের দিকে যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে তারই খুব কাছাকাছি দেয়ালের দিকে বোমার শব্দ হল। ধোঁয়া উঠল। কিছুক্ষণ গাড়ি থামালাম। বুঝতে বাকি রইল না যে সরকারি কারসাজি। একটু পর প্রমাণও পেয়ে গেলাম। এলোপাতাড়ি গুলি শুরু হল। জিরো পয়েন্ট ছেড়ে আমরা সামনে

www.pathagar.com

গিয়ে থামলাম। ট্রাকে করে পুলিশ আমাদের পেছনে পেছনে এগোতে শুরু করেছে ও এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সত্তর বছর বয়স্ক আজাহার সাহেব, যার সাদা চুল-দাড়ি শোভিত চেহারা যেকোনো মানুষের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। তাঁকে পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। টার্গেট ঠিক করে করে ওরা গুলি চালাতে থাকে। নূর হোসেন, বাবুলসহ বহু কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। ঠিক আমার গাড়ি লক্ষ করে ট্রাক থেকে গুলি চালানো হচ্ছিল। আমার গাড়ির কাছেই গুলিতে বহু কর্মী আহত হয়। গাড়ি নিয়ে তবু আমি এগোতে থাকি। এক সময় যখন আমরা গোলাপ শাহ্‌র মাজারের পাশে রমনা ভবনের মোড়ে আসি, এবার আমার গাড়ি লক্ষ করে বোমা ছোঁড়া হয়। বিকট শব্দে ফাটে বোমাটি। ধোঁয়ায় সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখি পুলিশের গাড়ি আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এরই মধ্যে কয়েকজন আহতকে তুলে নিয়ে অন্য একটি গাড়ি হাসপাতালে চলে যায়।

আমার গাড়ি থামিয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তা আমার ড্রাইভারকে নেমে যেতে বলে। সে নাকি নিজেই গাড়ি চালাবে। এই বলে চাবি কেড়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ায়। আমি প্রতিবাদ করি। এর মধ্যে আমাদের নজরে পড়ে গুলিবিদ্ধ নূর হোসেনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পনেরো দলের একজন কর্মী। পুলিশের লোকেরা রিকশা থেকে জোর করে নূর হোসেনকে ভ্যানে তুলে নেয়। এদিকে আমার গাড়িও সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে রেখেছে। আমি পুলিশকে অনুরোধ করলাম ওকে আমার গাড়িতে তুলে দিতে। হাসপাতালে নিয়ে যাব। কিন্তু আমাকে এক ইঞ্চিও এগোতে দিল না। ওকে নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা মিথ্যে বলেছিল। নিহত ও আহতদের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে অযত্নে ফেলে রেখেছিল। এবং পরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

এদিকে ওয়ারলেসে খবর আসতে থাকে আমাকে গ্রেফতার করার জন্যে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমার গাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে হাজার হাজার মানুষ ঘিরে রয়েছে। পুলিশও ব্যারিকেড সৃষ্টি করে আছে। জনতার মাঝ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ফেটে পড়ছে। একটি ছেলের কথা মনে পড়ছে। লুঙ্গির কাছা মেরে সে পুলিশকে রুখে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ জনতাকে ধাওয়া করছে কখনো রাইফেল তুলে, কখনো বেয়নেট বাড়িয়ে। কিন্তু তাতেও জনতা দমছে না। তাদের একটি কথা— 'আপাকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে দেখলাম মতিঝিল থানার একজন পুলিশ কর্মচারী ঢিল ছুড়তে শুরু করেছে। জনতার সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে ইচ্ছেমত গালিগালাজও শুরু করেছে। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। নামার জন্য আবার চেষ্টা করলাম, তাও নামতে দিল না, জোর করে গাড়ির দরজা ধরে আটকে রাখল। গাড়ির ড্রাইভারকে নেমে যেতে বলল, তার কাছে গাড়ির চাবিও চাইল। এবার সহ্য হল না। দিলাম ধমক, 'কেন চাবি নেবেন?'

পুলিশ বলল, 'আমি চালাব।'

'কেন চালাবেন? আমি কেন আপনাকে চালাতে দেব? প্রয়োজন হলে আমি নিজেই চালাব আমার গাড়ি।'

গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারের ওয়ারলেসে তখনও নির্দেশ আসছে, আমাকে গ্রেফতার করতেই হবে। আমার গাড়ি ঘিরে রাখলেও জনতার স্রোতের জন্য গ্রেফতার করতে পারছিল না। অদূরে দাঁড়ানো কয়েকজন কর্মীকে ওরা ট্রাকে তুলে নিল ও বেদম পিটাতে লাগল। সব সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল। পুলিশকে বললাম, 'জনতা দেখছেন? সবাইকে ডাক দিলে তখন কি অবস্থা হবে? কত পুলিশ আছে? আর কত মানুষের জীবন নেবেন, আজ হিসাব হয়ে যাবে। ভালো চান তো এখনই ওদের ছেড়ে দেন।'

ওরা তখন সচকিত হয়ে আমাকে ঘিরে রাখল। এদিকে জনতাও অধৈর্য হয়ে ধীরে ধীরে আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। পুলিশ নিজেই ঘেরাও হবার সম্ভাবনা দেখে ব্যারিকেড তুলে নিয়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে জনতার মিছিল। আবার স্লোগান তুলে আমাদের গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল।

জিরো পয়েন্ট ছেড়ে প্রেসক্লাব অভিমুখে যাবার পথে শুনলাম আবার পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এখানেও জনতার সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হল। আমি মুখ বাড়িয়ে পেছনে আসা পুলিশের গুলি থামাতে নির্দেশ দিলাম। আমার ড্রাইভার কার নির্দেশে যেন জোরে গাড়ি চালিয়ে প্রেসক্লাবের ভেতর ঢুকে পড়ল। দোতলায় বসে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করলাম। পরপর দুইদিন হরতালের ডাক দেয়া হল। প্রথমদিন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা, তার পরদিন দুপুরের পর শুধু রিকশা চলবে। নূর হোসেন, বাবুলসহ পাঁচজন নিহতের নাম এখানে বলা হল।

www.pathagar.com

প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়ে আমরা যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কদমফুল ঝর্ণার কাছে পৌঁছেছি, তখনও বুঝিনি আরও কিছু বিস্ময়, সামনে চমকপ্রদ রসিকতা অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তেই মনে হলো কোন দেশে বাস করছি আমরা! আমি জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেতা, আমার গাড়িতে জাতীয় পতাকা। সরকারি প্রশাসন আমাকে ঘেরাও করে, গুলিবর্ষণ করে, এটা কি জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা নয়! এরশাদ সরকারের নতুন পদ্ধতিটি দেখে হাসি পেল, এটা কোন ধরনের বর্বরতা? সরাসরি ক্রেন দিয়ে এবার আমাকেসহ গাড়িটা উঠিয়ে নিয়ে বন্দি করার কি আধুনিক পদ্ধতি! রাজনীতি করতে এসেছি যখন, তখন জেল– গুলি– অত্যাচার হবে তা জেনেই এসেছি। ছোটবেলা থেকে বাবাকে তো দেখেছি, সে অভিজ্ঞতা আমাকে রুখবে কেমন করে? একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি থাকার তিক্ত মুহূর্তগুলো তো আমার এখনও মনে আছে। মৃত্যুও যেকোনো সময়ই তখন হতে পারত। আমাকে দুর্বল ভাবার সাহস হয় কি করে ওদের! ১৯৮৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ছয় বার বন্দি অবস্থায় নিঃসঙ্গ মুহূর্ত কাটানোর অভিজ্ঞতাও আমার রয়েছে।

দেশ ও জনগণের জন্য কিছু মানুষকে আত্মত্যাগ করতেই হয়, এ শিক্ষাদীক্ষা তো আমার রক্তে প্রবাহিত। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর পর প্রবাসে থাকা অবস্থায় আমার জীবনের অনিশ্চয়তা ভরা সময়গুলো আমি তো দেশের কথা ভুলে থাকতে পারিনি? ঘাতকদের ভাষণ, সহযোগীদের কুকীর্তি সবই তো জানা যেত।

অধিকার হারা মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে নেমেছি, জেল বা গৃহবন্দি হওয়া তো কিছুই নয়। কথায় বলে, 'গলায় যদি ফাঁসির ডোর, হাতকড়াতে ভয় কি তোর।' দুঃখও হয় হাসিও পায়—এরা আমার জন্য কত ফন্দি-ফিকিরই না বের করেছে।

প্রথমেই আমাদের গাড়ির সামনে পুলিশের জিপ ও ক্রেন দিয়ে গতিরোধ করল। এরপর থাবা দিয়ে ড্রাইভারের হাত থেকে চাবি কেড়ে নিল। আমি ড্রাইভারকে গাড়ি পেছনে ঘোরাতে বলছিলাম। ড্রাইভার জানাল। 'চাবি নিয়ে গেছে।'

ক্রেন থেকে খুব মোটা মোটা চেন নামিয়ে ওরা আমাকেসহ গাড়ি বাঁধার প্রস্তুতি নিল। সেই মুহূর্তে সকলকে গাড়ি থেকে নামতে বললাম, নিজেও নামলাম। তারপর পায়ে হেঁটে প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকলাম।

www.pathagar.com

কয়েকজন পুলিশ 'ম্যাডাম' 'ম্যাডাম' বলতে বলতে পেছনে এলো, আমার কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না। ওরাও আর প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকল না। সামনের রাস্তায় ঘিরে ছিল; আমার গাড়ির চাবি আটকে রেখেছিল। সাড়ে তিনটা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে থাকতে হল।

তারপর সোজা বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে গেলাম। সেখানেও পুলিশ বাড়ি ঘিরে রাখল। সন্ধ্যায় আবার সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে নিহত ও আহতের খবর, জনতার মিছিলের খবর আসতে লাগল।

পরদিন ১১ নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে আমি বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে বের হলাম প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে যাবার জন্য। যেই গেট দিয়ে বের হয়ে রাস্তায় নেমেছি পুলিশ আমায় ঘিরে ধরল ও জিপে উঠাতে চাইল। জিপে কোথায় নেবে তার কি কোনো ঠিক আছে? আমরা আপত্তি জানালাম। মিরপুর রোড পর্যন্ত যাবার পর মহিলা পুলিশ ও অন্যান্য পুলিশরা আমাকে ঘিরে ধরল এবং যেতে বাধা দিল। রাস্তায় তখন হাজার হাজার মানুষের ভিড়, ক্রমশ তারাও বিক্ষুব্ধ হতে থাকল। এখানেও শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন। তারাও একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। একজন বিদেশি সাংবাদিক, সম্ভবত ফরাসি টেলিভিশনের, বার বার প্রশ্ন করছিলেন, 'হোয়াট ইজ দ্যা চার্জ? হোয়াট ইজ দ্যা চার্জ?' পুলিশ আমার গতিরোধের বা গ্রেফতারের সরকারি নির্দেশ দেখাতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক হলো। এক সময় তারা জোর খাটাল বঙ্গবন্ধু ভবনে ফেরার জন্য। মহিলা পুলিশরা আমার হাত ধরার চেষ্টা করল, কে একজন ধমক দিল। হেঁটে আমিই তখন ফিরে আসি বঙ্গবন্ধু ভবনে। পুলিশ আর বাড়াবাড়ি করল না। তবে সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমার আর কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হচ্ছিল না।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই বাড়িটি কোলাহলমুখর ছিল। আমারও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আমি যেন এক বিরাট শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করলাম। তবে একাকিত্ব আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। জীবনের বহু মূলবান সময়ে আপনজনদের স্মৃতি আমার সাথী। বসার ঘরে ঢুকে বসে পড়লাম। আমার সামনে শূন্য এই ঘরখানায় প্রতিদিন কত মানুষ ভিড় জমায়। দেখা করেও কুলোতে পারি না। কত মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়, পাঁচ-দশ মিনিট পর পর সময় দিলেও কাজের শেষ হয়

www.pathagar.com

না। সকলকে খুশি করতে পারি না—কতজনের কথা শেষ হয় না। আর আব্বার প্রমাণ সাইজের ছবি, দুই হাত তুলে তিনি যেন বলছেন 'ভায়েরা আমার।' পাশেই মায়ের ছবি, সব কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করবার মতো শক্তি যার কাছে থেকে শেখা— আত্মত্যাগের সেই মূর্ত প্রতীক।

খানিক পর আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। দূরে স্লোগানের আওয়াজ ভেসে এল।

আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ওরা কি আবারও কোনো জীবন কেড়ে নিল? আর কত রক্ত চায় এই ঘাতকের দল?

কত তাজা প্রাণ রাজপথে বুকের রক্ত দিয়ে লিখে যাচ্ছে—এই সমাজ বদলে দাও, আমরাও মানুষ, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, ক্ষুধা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাই। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম চলবেই চলবে।

নূর হোসেনের কথা বার বার মনের কোণে ভেসে উঠছিল। ইতিহাসের পাতায় রক্তের আখরে আর একটি নাম সংযোজিত হলো অনেক নামের সাথে। নূর হোসেন মরেনি। বেঁচে আছে। অমর হয়ে আছে। জীবন দিয়েই নূর হোসেনরা বেঁচে থাকে হাজার মানুষের স্মৃতিতে। বেঁচে আছে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে। কেন জীবন দিতে হয় নূর হোসেনদের? কি তাদের অপরাধ?

অপরাধ, ও বাঁচতে চেয়েছিল। সুন্দর জীবন চেয়েছিল। ওর অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল, মেধা ছিল। দরিদ্র বাবা-মা দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতেই হিমশিম খেত, ওর মনের চাহিদা মেটাবে কি করে? ওর মেধাবিকাশের সুযোগ দেবে কি করে?

সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল পুরোনো ঢাকার গলিতে ছোট্ট একটি কামরায়। কোনোমতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাথা গোঁজানো। স্কুটার চালিয়ে দিনশেষে ঘরে ফেরে নূর হোসেনের বাবা। সামান্য রোজগার। ছেলেদের লেখাপড়া শেখার দারুণ ঝোঁক। স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মনে আশা যদি লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে পারে, একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে পারে। পাঁচ-ছয় ক্লাস পর্যন্ত কোনোমতে পড়াশোনা করবার পর আর ওদিকে মন থাকল না নূর হোসেনের। নিয়মিত বেতন দিতে পারে না, শিক্ষকদের গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। বইখাতা সময়মতো কিনতে পারে না, কেবলই পিছিয়ে যায়। সকালে বাসি ভাতও পায় না, পেটে ক্ষুধার জ্বালা,

www.pathagar.com

পড়ায় মনে বসাতে পারে না। কলের পানিতে কতক্ষণ থাকা যায়। ফিরে এসে যে এক মুঠো ভাত জুটবে তারও নিশ্চয়তা থাকে না। কোনোদিন কপাল ভালো জুটে গেল, কোনোদিন মায়ের শুকনো মুখ। ভাত চাইতে মায়ের চোখের কোণ ভিজে ওঠে, মুখে বলতে হয় না, বুঝে ফেলে। ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। হয়তো ডাংগুলি খেলে যন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করে, ক্ষুন্নিবৃত্তির ভিন্ন কোনো পথ ধরলে তাৎক্ষণিক ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেলেও বিবেকের যন্ত্রণা দগ্ধ করে। বহু শিশু হয়তো এভাবে বিপথে চলে যেতে বাধ্য হয়।

কখনও মায়ের রুদ্র মূর্তি, ভাত চাইতেই হাতে চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে আসেন, মায়ের এ রুদ্র মূর্তি কিসের প্রকাশ? মা হয়ে সন্তানের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে পারছে না। এ যে কি বড় কষ্ট, কি যন্ত্রণা, কি ভীষণ আত্মগ্লানি— কিভাবে চেপে রাখবে মা! মায়ের রাগ এ সমাজের উপর, সংসারের উপর, রাষ্ট্রের উপর। সন্তানের উপর নয়।

এই পরিবেশ থেকে বেড়ে উঠেছে নূর হোসেন। চোখে স্বপ্ন ছিল সমাজের পরিবর্তন হবে। মাকে সে বলতো, দিন একদিন আসবে, তোমাদের আর ভাঙ্গা ঘরে থাকতে হবে না, কষ্ট করতে হবে না। সুন্দরভাবে থাকতে পারবে। না খেয়ে কেউ কষ্ট পাবে না, আমরা সেই সমাজ গড়ব। এই স্বপ্ন একা নূর হোসেনের নয়, এ দেশের লক্ষ কোটি নূর হোসেনের।

সেই সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়েই দুঃখী মানুষের হাসি ফোটাবার অঙ্গীকার নিয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দীর্ঘ ২৩ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন। পাকিস্তানি শাসক-শোষকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগড়ার পাশাপাশি সমাজ-পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধী পরাজিত শক্তি প্রতিশোধের নেশায় ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল, আর ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের দল ১৯৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল জাতির জনককে হত্যা করে। মাত্র ৩ বছর ৭ মাস এদেশের মানুষ সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল। তারপর শুরু হল ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। সেনাছাউনিতে বসে একের পর জেনারেলরা সামরিক বাহিনীর অফিসার, জোয়ান ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের রক্তের হোলি খেলতে

www.pathagar.com

শুরু করল। ক্ষমতা বদলের মাধ্যম হল বুলেট, অর্থাৎ অস্ত্র। ব্যালট, অর্থাৎ জনতার মৌলিক ভোটাধিকার পদদলিত করা হল। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে চলল। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রতি উত্তরে আসে বুলেট, নূর হোসেনের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

কিন্তু 'নূর হোসেন তোমার প্রতি সমগ্র জাতির আজ অঙ্গীকার। তুমি প্রতিবাদের প্রতীক। এ অবস্থার পরিবর্তন আমরা ঘটাবই। তুমি আজ প্রতিবাদের পোস্টার হয়ে রয়েছ প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙালির হৃদয়ে। তোমাকে হাজার সালাম।' আমাদের অঙ্গীকার: 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।'

রচনাকাল : ১৭.০১.১৯৮৯

www.pathagar.com

একানব্বইয়ের ডায়েরি

১.

সমগ্র চট্টগ্রাম তথা উপকূলীয় বিশাল জনপদকে পর্যুদস্ত করে প্রচণ্ড সাইক্লোন তার ভয়াবহ তাণ্ডব নাচের প্রলয়ংকরী স্বাক্ষর স্থাপন করে গেল। কিন্তু সে রুদ্ররূপের প্রচণ্ড নৃশংসতার যে চিহ্ন ভয়াবহ দন্ত বিস্তারে ক্ষতের সৃষ্টি করে রেখে গেল তার বর্ণনা দেয়া কোনো কলমের পক্ষে সম্ভব কিনা আমার তা জানা নেই। আমি দেখেছি, সেই অভিশপ্ত বালুকাবেলায় লুটিয়ে শক্ত হয়ে পড়ে থাকা নারী-পুরুষের যুগল লাশ। বৃদ্ধা, যুবক আর শিশুর মৃত্যু। মানবসন্তান আর গো-শিশুর গলাগলি করে জড়িয়ে মরে পড়ে থাকার বীভৎস দৃশ্য। আমাকে বিমূঢ় করেছে, বেদনায় ব্যাকুল করেছে, গাছের শাখায় চুলে লটকে থাকা দুর্দান্ত কিশোরী কিংবা বিনম্র গৃহবধূর বেআব্রু, উলঙ্গ শবদেহ। পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে ছবি আর মৃত্যুর খবর। প্রলয়ংকরী এই ঘূর্ণিঝড়ের ফেলে যাওয়া বিধ্বস্তরূপ যে কত ভয়াবহ, কত নিদারুণ আর কত যে হৃদয়-বিদারক, নিজ চোখের দর্শন ব্যতিরেকে তা অনুভব করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয় বলে আমার বিশ্বাস।

২.

রাজা লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনের বাংলাদেশ। ঈশা খাঁ, ক্ষুদিরাম আর তিতুমীরের বীর বাংলা। সিরাজউদ্দৌল্লার প্রিয় বাংলাদেশ, রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত আর জীবনানন্দ দাশের অপরূপ মোহিনী রূপের এই রূপসী বাংলা। শেরেবাংলা, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী আর বঙ্গবন্ধু'র সোনার বাংলা। বর্গী,

www.pathagar.com

পর্তুগিজ, মগ এবং বেনিয়া ইংরেজ, সবশেষে পাকিস্তানি হার্মাদ শাসনকালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কয়েক শতাব্দীর নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনার করালগ্রাসে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে এই দেশটি আজ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। রোগ, শোক, মহামারি, ঝড়, বন্যা, তুফান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শাসকের চাবুক, লাঠি, বেয়নেট, গুলি কোনোকিছুই ন্যুজ করে দিতে পারেনি বীরপ্রসূ বীর জাতিকে।

আমার মনে পড়ে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২-এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, আমার বাবা শেখ মুজিব জল্লাদের মৃত্যু বিভীষিকাময় পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসে রমনার রেসকোর্স ময়দানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ...'কবিগুরু আপনি আজ এসে দেখে যান, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। আপনার বাণী আজ মিথ্যা হয়ে গেছে ...'

'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালি করে— মানুষ করনি।'

কবিগুরু আপনি আজ দেখুন, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।

৩.

আজ তিনি নেই। কিন্তু ১৯৫২, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং দুর্জয় ১৯৭১-এর গতিপথ বেয়ে ১৯৯০-এর যে সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী প্রবল আন্দোলনের বিজয়, তা যেন সেই একই মূর্ছনায় অনুরণন ঘটাতে চায়—

'কবিগুরু, আপনি আজ এসে দেখে যান...'

ঘূর্ণিঝড়-এর সংবাদ পেয়েই আমি মনস্থির করে ফেললাম, আমি চট্টগ্রাম যাব। আর কেউ যাক কিংবা না-যাক আমি যাব, সেই স্বজনহারা মানুষের কাছে। সেই বিলাপ আহাজারিতে রত সন্তানহারা মা, জীবনের সকল তৃপ্তি আর সুখের মুখে ছাই চেপে দেয়া স্বামীহারা সদ্য বিধবার পাশে আমি গিয়ে দাঁড়াব। আমি জানি কিছুই দেয়ার ক্ষমতা নেই আমার। ক্ষমতা যাদের হাতে তারা কি করবেন আমি তাও জানি না। আমি শুধু এটুকুই জানি এই বিপন্ন মানবতার পাশে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। এই হতভাগ্য মানুষদের জন্য আমি আর কিছুই করতে না পারি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনার কথাটুকু তো অন্তত বলতে পারব।

www.pathagar.com

৪.

চট্টগ্রাম! বীরপ্রসূ চট্টগ্রাম! বীর সূর্যসেন আর কালজয়ী প্রীতিলতার পুণ্য স্মৃতিজড়িত এই চট্টগ্রাম। বীরের রক্তস্নাত এ মাটি। মহাকবি আলাওলের সুধাময়ী সুর-জালের মূর্ছনা তোলা এই জনপদ। সে রোসাঙ্গদেশ বা রোসাঙ্গরাজের আজ অস্তিত্বও নেই। কিন্তু আছেন মহাকবি আলাওল। আছে চট্টগ্রাম! সাগর বেষ্টন যাকে আবদ্ধ করেছে— মহাপ্রেমে, মহামায়ায়।

সাগর! সীমাহীন উত্তাল ব্যাপ্তিতে ফেনায়িত তরঙ্গের বিহঙ্গ নাচন তুলে যে আছড়ে পড়ে। কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে বিরাট উপকূলীয় সীমানার। সে গম্ভীর সৌম্য-স্থিতধী অনিবার, কেবল প্রশান্তিরই জন্ম দেয় মানুষের অন্তরে। সে সাগর আমার বড় প্রিয়। এই সাগরপাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দর্শন সব সময়ই আমাকে বড় ব্যাকুল করে তোলে। নির্মল প্রশান্তিতে ভরে যায় আমার সমস্ত অন্তর।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ধীরে ধীরে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের এ এক অপূর্ব দৃশ্য! মনে হয় সূর্যটা সমুদ্রের মাঝেই যেন লুকিয়ে পড়বে। আর লুকিয়ে যাবার কিছু আগে তার আলোর শেষ রশ্মি নানা রঙে, নানা বর্ণে, দিগন্ত জুড়ে যেন ছড়িয়ে দেয়। সমস্ত আকাশ ও সাগর সেই রূপে অবগাহন করে আরও কিছু বিচিত্র রঙে, ছটা ছড়িয়ে দেয়।

কোথাও লাল, কোথাও কমলা, কোথাও নীল, কোথাও সবুজ। অথবা হয়তো কোথাও শুধু নীলেরই কেবল মাখামাখি। গাঢ় নীল, হালকা নীল, ফিরোজা নীল, বেগুনি নীল। যেন হাজার নীলের রকমফের। প্রতি মুহূর্তেই এই রঙের পরিবর্তন হচ্ছে। সাগরতীরে দিনের শেষসূর্য, শেষরশ্মি বিকিরণ করে কত রঙে, সমারোহ যে প্রদর্শন করছে। প্রকৃতির কি অপরূপ রূপ। চোখের পলক ফেলা যায় না। মনে হয়, সেই মুহূর্তে যদি সুন্দরকে উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি। সাগরের গায়ে বিছিয়ে দেয় শেষ আলোর রশ্মি ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে, আলোর খেলা খেলে যায়। গোটা সমুদ্র সৈকতের অপরূপ রূপে মুগ্ধ আমি। প্রকৃতির বিশাল ক্যানভাসে শিল্পীর মোহন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই যে নিপুণ তুলির টান, বহুবার এ চিত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

www.pathagar.com

যেখানে এত সৌভাগ্য আর সেখানেই এত নিষ্ঠুরতা? প্রকৃতির কি বিচিত্র খেয়াল!

সূর্য যখন পাটে বসে একটু একটু করে সাগরে যায়। আলোর খেলাও যেন ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কিছু গাংচিল সেই আলোর মাঝ দিয়ে উড়ে যায়। কখনও মাছ-ধরার নৌকা সে আলোতে অবগাহন করে যেন এগিয়ে আসে দিগন্তের পাড় অতিক্রম করে। এ যেন সুন্দরের এক বিরাট মেলা বসেছে প্রকৃতি জুড়ে। সুন্দর! অপরূপ সুন্দর! চারিদিকে যা দেখি তা সবই সুন্দর। যা কিছু বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তা সবই বড় আকর্ষণ করে। আর যতবার চট্টগ্রামে যাই, যত কাজই থাকুক-না-কেন সাগরপাড়ে একবার যাবই।

সাগরকে আমি বিভিন্নরূপে দেখেছি। দেখেছি সকালের মৃদু আলোতে যখন দূর পাহাড়ের চূড়া দিয়ে সূর্য ধীরে ধীরে তার দিনের আলো বিকিরণ করতে করতে উঠে আসে। অন্ধকার রাত্রির অবসান ঘটিয়ে। এ যেন আলো হাতে উঠে আসছে জীবনের স্পন্দন জাগাতে। অন্ধকারের বুক চিরে বালুকাবেলায় আলোর আগমন জীবনকে দেয় জাগিয়ে।

দেখেছি পূর্ণিমা-রাত। বালুকাবেলায় জ্যোৎস্নাভরা রাতে শুনেছি পূর্ণ জোয়ার সাগরের! দুরন্ত গর্জন। পূর্ণিমা-রাতে যখন ভরা জোয়ার, সাগর তখন কানায় কানায় ভরা। সাগরপাড়ে বসে দেখেছি সে অপরূপ রূপ। দুচোখ ভরে দেখেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। এত সুন্দর? সেই জ্যোৎস্নায় বালুকাবেলায় সাগরের অপরূপ রূপে হয়েছি অভিভূত। হয়েছি মুগ্ধ।

এই যে অপরূপ রূপের লীলাভূমি। এই যে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেখানে আজ গলিত মনুষ্য আর পশুদেহের বীভৎস দুর্গন্ধ। স্বজনহারার কাতর আহাজারি আর আহতের আর্তনাদে আজ সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চলেছে এক মূর্তিমান বিভীষিকা।

৫.

১৯৭০-এর নভেম্বরে আর একবার এমনি এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বিরান করে নিয়ে গিয়েছিল উপকূলীয় এই বিশাল জনপদকে। আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত রেখে ছুটে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামের শোকার্ত মানুষের পাশে। দিনের পর দিন তিনি পড়ে থেকেছিলেন উপদ্রুত

www.pathagar.com

এলাকায়। রাতের পর রাত কেটেছিল তাঁর শোকার্ত ব্যাকুল হতাশ মানুষের সাথে।

১৯৭০-এর সেই দিনগুলো ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির এক ক্রান্তিকাল। তা সত্ত্বেও সকল রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ফেলে দিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলেন তিনি। বাংলার মানুষের সেই প্রাণপ্রিয় মহান নেতা বঙ্গবন্ধু, আমার বাবা শেখ মুজিবুর আজ আর নেই।

তাঁর আরাধ্য শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি গণমানুষের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির পথ ধরে তাঁরই অসমাপ্ত রাজনীতির উত্তরাধিকার বহন করছি আমি, প্রচণ্ড শোককে অন্তরে লালন করে।

তিনি নেই। কিন্তু আমিতো আছি। যে দেশের জন্য, যে জাতির জন্য ৫৪ বছরের জীবনের ২৫টি বছর তিনি অন্ধ কারাকক্ষের কড়িকাঠ গুনে গুনে অতিক্রম করে গেছেন প্রচণ্ড যৌবন কারাগারের উঁচু প্রাচীরের সীমানার মধ্যে। ফাঁসির রজ্জুকে যিনি উন্নত মস্তকে ধারণ করতে এগিয়ে গেছেন বহুবার, শুধু এই জাতির জন্য। এ দেশের মানুষের জন্য! সেই মহান মানুষের ভালোবাসার জাতি আর মানুষই আমার কাছে তাঁর বড় আমানত। আর সেই আমানতকে শিরোধার্য করেই আমি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত থাকতে চাই সোচ্চার, এদেশের মানুষের অধিকারের প্রশ্নে, তাঁদের স্বার্থের প্রশ্নে।

৬.

সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ট্রেনে উঠলাম রীতিমতো তাড়াহুড়ো করে। আমার সঙ্গে ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। রীতিমতো তাড়াহুড়ো করেই উঠতে হলো এইজন্য যে, আমাদের যাবার কথা ছিল প্লেনে। এয়ারপোর্ট রওয়ানা হব, হঠাৎ শুনলাম প্লেন যাবে না। রানওয়ে এখনও ঠিক হয়নি। তবে চেষ্টা চলছে দুপুরে হয়তো হয়ে যেতে পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। সত্যি বলতে কি আমার তর সইছিল না। মনের মাঝে সততই আকুলি-বিকুলি করছিল, ওখানকার মানুষেরা কি অবস্থায় আছেন তা স্বচক্ষে দেখা দরকার। এই বিপদের দিনে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে আর কিছু না পারি তাদের মাঝে থাকতে চাই, তাঁদের সাথে থেকে তাদের দুঃখের

www.pathagar.com

একজন ভাগীদার হতে চাই, যা পারি যৎসামান্য সাহায্য করার অভিপ্রায়ে টাকা-পয়সা যা ছিল সঙ্গে নিলাম। কিছু যোগাড়ও করে নিলাম নানাজনের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে। অনেকে আবার চাইবার আগে আগেই দিয়ে গেলেন আমাকে, আমি যাব একথা শুনে।

আমি যাচ্ছি মৃতের নগরে। ছেলে-বুড়ো-শিশু আর নারী কাতারবন্দি হয়ে যেখানে সেখানে মরে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে ভাবি—আর কত মৃত্যুর আর কত রক্তের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের এই জাতির।

৭.

স্মৃতির পটে কখনো ভেসে ওঠে আমার শিশুবেলার ১৯৫২ সাল। বাবা শেখ মুজিব কারাগারে অনশন করছেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য। আর রাজপথে গুলিতে ঢলে পড়লেন কালজয়ী বাঙালি সন্তান রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিকসহ আরও কত নাম-না-জানা বীর-তরুণ।

১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার কারণ সৃষ্টির জন্য আদমজি মিলে যে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা সংঘটিত করা হয়েছিল, সেই অজস্র রক্তের স্রোত আর মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের একাকী ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণের বিনিময়ে দাঙ্গারোধের সর্বাত্মক চেষ্টা আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর। এল ১৯৬২। হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল এদেশের সূর্যসন্তান ছাত্রসমাজ। গড়ে উঠল দুর্বার ছাত্র-আন্দোলন। রাজপথে ঢলে পড়ল কত দৃপ্ত অঙ্গীকারের প্রতিভাবান তরুণ।

তারপর ১৯৬৬। ছয়দফা আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে গিয়ে মনু মিয়া রাজপথে ঢলে পড়ল।

১৯৬৮-তে আগরতলা মামলাবিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এ সেই পথ ধরেই যে প্রবল গণঅভ্যুত্থান এবং যে ব্যাপক রক্তদান আমার স্মৃতিতে-আজও সেসব বেদনাঘন স্মৃতি জ্বল জ্বল করছে। ১৯৭০-এর নভেম্বর ছোবল হানল সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়, ভয়াল গোর্কি। ভাসিয়ে নিয়ে গেল মানুষ, গবাদিপশু, মাঠের ফসল। বিরান করে দিয়ে গেল বিস্তীর্ণ জনপদ।

www.pathagar.com

৮.

'বঙ্গবন্ধু' ১৯৭১-এ ডাক দিলেন স্বাধীনতার—

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানি হার্মাদ সৈন্যরা হত্যার তাণ্ডব শুরু করে দিল গ্রামগঞ্জে, নগরে আর জনপদে। ৩০ লাখ বাঙালি হলেন শহীদ। এল স্বাধীনতা, এল বিজয় ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর— বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষ ভাবল, রক্ত দেয়ার পালা বুঝি শেষ হল। কিন্তু ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ আবার ঘটল পতন। জীবন দিলেন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে, বিদেশি চক্রান্তকারীদের এদেশীয় এজেন্টদের হাতে। আবার শুরু হলো জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত। আবার শুরু হল রক্তদানের সংগ্রাম।

ময়েজউদ্দিন, তিতাস, রমিজ, বাসুনিয়া, চন্নু এমনি হাজার আত্মাহুতির প্রয়োজন হলো গণতন্ত্রের জন্য, অধিকারের লড়াইয়ে।

উদাম নূর হোসেন যেদিন বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে জীবন্ত পোস্টার আর সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ হয়ে আমাকে সালাম করে বলল, 'আপা, আমাকে দোয়া করবেন'— ভীষণভাবে আঁতকে উঠেছিলাম আমি। আতঙ্কে চিৎকার করে বলেছিলাম— 'শার্ট পরো। এ্যাই ছেলে, শার্ট পরো।' বারণ মানেনি সেদিন বীরপ্রসূ বাংলার বীর-সন্তান নূর হোসেন। ঘাতক বুলেট নিথর, নিস্পন্দ, স্তব্ধ করে দিয়েছিল সেই সচল প্রতিবাদকে। সেই জীবন্ত গণতন্ত্রপ্রেমিক পোস্টারকে।

ডা. মিলন, শিশুকে স্তন্যদানরত গৃহবধূ হাসিনা বেগম। আর কত নাম বলব! মৃত্যুর ফিরিস্তি করতে করতে এখন ক্লান্ত আমি। আর পারি না। এ্যাতো মৃত্যু, এ্যাতো রক্ত!

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট আমার সকল স্বজন, সকল আপন, সকল বন্ধনই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আর আমার ছোট বোন রেহানা তখন জার্মানিতে। সে সময় সেখানে ছিল আমার স্বামীর কর্মস্থল। সেই প্রবাসে বসেই সংবাদ পেলাম দীর্ঘ তিন দশকের বাঙালি প্রতিবাদের সোচ্চার

www.pathagar.com

কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধু, আমার বাবা শেখ মুজিব নেই। নেই আমার তিন ভাই, নবপরিণীতা দুটি বধূ, আমার স্নেহময়ী মা, আর পরিবারের অন্য স্বজনেরা। নেই কর্নেল জামিল। এ শোকের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রিয় পাঠক, আমার এ দৈন্য ক্ষমা করুন।

৯.

রক্তে রক্তে যেন পিচ্ছিল হয়ে গেছে এ বাংলার মাঠ, প্রান্তর, রাজপথ। গাঢ় সবুজের এই যে আমাদের দেশ। সাগর, নদী, খাল-বিল আর ফসলী মাঠের দেশ। ঘুঘু-হরিয়াল আর কোকিলের কুহু ডাকে মুখরিত দেশ। বারো মাসে তের পার্বণ, নবান্ন আর বর্ষবরণে কোলাহলের দেশ।

অর্থনৈতিক দীনতা আজ একে করেছে ম্রিয়মাণ। দেনার দায়ে কৃষক আজ সর্বস্বান্ত। পেটের ভাতের জন্য শ্রমিক আজ অবসন্ন। ভয়াবহ বেকারত্ব কুরে কুরে খাচ্ছে। সমস্ত সমাজটার কী দুর্বিসহ অবস্থা! এর আগেই আবার আঘাত হানল ঘূর্ণিঝড়।

আমাদের কর্মীদের একে তো যে অবস্থা, তাতে শুনছি সব নিঃস্ব হয়ে গেছে এই সর্বনাশা সাইক্লোনে। অনেকেই নিখোঁজ। মন মানছে না। সমস্ত অন্তরটা যেন আমার হাহাকারে ভরে গেছে। আমি কিছুতেই ঢাকায় টিকতে পারছিলাম না। তাই যখনই শুনলাম প্লেন যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম ট্রেনেই যাব। হাতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে তড়িঘড়ি করে রেলস্টেশনে ছুটলাম। কমলাপুর রেলস্টেশনে আমাদের কর্মীরা ছিল। তারা আমাকে বিদায় দিল। ট্রেন ছেড়ে দিল, হাতে দৈনিক কাগজ নিয়ে বসলাম। ভয়াবহ অবস্থা! এদেশের মানুষগুলো সত্যিই বড় দুর্ভাগা। আজকের কাগজে আছে প্রায় তিন লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, 'যত মানুষ মরবার কথা ছিল তত মানুষ মরে নাই।' জানি না আরও কত মানুষ মরলে তার 'যত মানুষ মরার কথা' তত মানুষ হবে, সেটাই প্রশ্ন। আর কত লাশ তিনি চান?

জানি না এভাবে কথা তিনি কি করে বলেন। মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি যাদের তাঁরা করুন।

www.pathagar.com

ট্রেন এগিয়ে চলছে। ফেনীর পর থেকেই একটু একটু করে ঝড়ের ছোবলের চিহ্ন পেতে শুরু করলাম। যতই চট্টগ্রাম কাছে আসছে ততই ঝড়ের তাণ্ডবলীলা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চট্টগ্রামে যখন নামলাম মনে হলো মৃতপুরীর স্টেশন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্টেশনে এসেছেন। কিন্তু দেখলাম সকলেরই চোখের কোণে পানি। কেউ কেউ কেঁদেই ফেললেন, 'কি দেখতে এলেন? আমাদের কিছু নেই। সব শেষ। আমরা নিঃস্ব।' এই আসা আর সেই আসা কত তফাত। সেই ছোট্ট বেলা থেকে চট্টগ্রামে আসি। যখনই আসি সে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। আমাদেরও মনে হতো যেন কত আপন জায়গা। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি চট্টলা যেন দু'হাত বাড়িয়ে স্নেহের ছায়ায় টেনে নিত আমাদের অনাবিল আনন্দে ভরে দিত সবকিছু। কিন্তু আজ সেই উচ্ছ্বাস নেই। সেই উল্লাস নেই। আনন্দ নেই। দু'চোখ ভিজে আসছে। নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছি না। গাড়িতে উঠে রওনা হলাম। কোনো গাছে পাতা নেই। সব যেন পুড়ে গেছে। পাহাড়তলীর পাহাড়ের লম্বা ঘাসগুলো পর্যন্ত পোড়া। বড় বড় গাছগুলো পাতাবিহীন। কয়েকটি ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওরাও যেন কিছু বলতে চায়।

কাঁচা বাড়িঘর সবই ভাঙা মনে হয়। যেন একটা প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে প্রকৃতি তার তাণ্ডবনৃত্য চালিয়েছে। কোনো ডাইনি যেন রাজকন্যার উপর অত্যাচার চালিয়ে বিধ্বস্ত করে প্রতিশোধ নিয়েছে।

চট্টলা। বীর চট্টলা! আজ একি অবস্থা? আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই। তাই আমার ভাষার ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। আমি ভাষা দিয়ে আমার মনের পরিপূর্ণ অনুভূতিকে বর্ণনা করতে পারছি না। যা বলতে চাই তার সবটুকু যেন বলতে পারছি না।

আমার একটা দৃশ্যই পাশাপাশি মনের কোণে স্মৃতির পাতায় জেগে উঠল। আজকের চট্টলাকে শুধু সেই দৃশ্যের যেন তুলনা করা যায়।

১০.

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন ক্যাম্পে বাঙালি মেয়েদের বন্দি করে রেখেছিল এবং তাদের উপর নির্যাতন

www.pathagar.com

চালাত। অনেক মেয়ে সেই লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে শাড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করত বলে তাদের শাড়িও পরতে দেয়া হতো না।

১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর কাছে হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে যখন সেই নারীদের উদ্ধার করা হয়েছিল, তখন তাদের যে চেহারা আমরা দেখেছিলাম আমার আজকের চট্টগ্রামকে দেখে সেই ধর্ষিতা বিবস্ত্রা নারীদের কথাই বার বার মনে পড়ছে। একমাত্র তাদের সাথেই আজ চট্টগ্রামের তুলনা করা চলে। প্রচ্ছন্ন এক যন্ত্রণায় মনটা টনটন করে ওঠে। কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল, অদম্য কষ্টকে চেপে রাখার চেষ্টায়। ভেতরটা হু হু করে কেবলই প্রশ্ন করছে— 'এ্যাতো সুন্দর! এ্যাতো সবুজ! আজ কোথায় হারিয়ে গেল!'

----

www.pathagar.com

www.pathagar.com

9789840419944